গম্ভীর প্রকৃতি; তাঁহাকে দেখিলেই সর্ব্বগুণের আধার বলিয়াই মনে হয়। এক্ষণে আপনারা কৃপা করিয়া, তাঁহাদিগের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলে, আমি অনুগৃহীত হই।"

মুনিকন্যাগণ সাবিত্রীর এইরূপ বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "অবন্তি নগরে দ্যুমৎসেন নামে এক পরমধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে বিপক্ষ নরপতিগণ বৈরনির্যাতনের অবসর পাইয়া, তাঁহার রাজ্য ও ধন হরণ করিয়া লয়। রাজা ঈদৃশ হীনাবস্থায় রাজ্যলক্ষ্মী পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মালোচনায় তৃপ্তিসাধনমানসে বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়মহিষী শৈব্যা, রাজাকে রাজ্যনাশে বনবাসী হইতে দেখিয়া, পতিসেবা স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, তাঁহার বনবাসের সঙ্গিনী হইয়াছেন। রাজদম্পতীর একমাত্র পুত্র সত্যবান্ তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলেই হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।"

সাবিত্রী মুনিকন্যাদিগের মুখে সত্যবানের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকেই নিজের ও পিতার মনোমত পাত্র বিবেচনা করিয়া পতিত্বে বরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া দেখিলেন; দেবর্ষি নারদ রাজসভায় পিতার সমক্ষে উপবিষ্ট আছেন। সাবিত্রী পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, দেবর্ষি নারদ তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বৎসে রাজর্ষিতনয় সত্যবান্ অল্পায়ু আর এক বৎসর অতীত হইলেই তাহার জীবন শেষ হইবে, অতএব তুমি তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর।"

সাবিত্রী ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দেব! আমি তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, আপনার ধর্ম্মবিগর্হিত ভয়প্রদ বাক্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" নারদ সাবিত্রীর এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আপনি সন্তুষ্টচিত্তে সত্যবান্‌কে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সত্যবান্ দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিবেন এবং সাবিত্রী শত পুত্রের মাতা হইবেন।"

রাজা অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের এই অনুকূল বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক, সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সাবিত্রী আশ্রমে থাকিয়া স্বামিসহবাসে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে, সাবিত্রীর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় কত দিনে বৎসর শেষ হইবে, সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৎসর

অতীত হইতে আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিন দিন গত হইলেই চতুর্থ দিনে প্রাণনাথের প্রাণান্ত হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার অনুক্ষণ অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল। তিনি পতির মঙ্গলার্থ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিনত্রয় অতিবাহিত হইলে তিনি প্রাণবল্লভের সহচারিণী হইয়া ফলাহরণার্থ বনে গমন করিলেন। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ফল মূল আহরণ করিবার পর সত্যবান্ প্রণয়িনীকে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক বৃক্ষমূলে বসিতে বলিয়া কুঠার হস্তে ইতস্ততঃ কাষ্ঠাহরণ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া অবনতমস্তকে একবার দেবর্ষি নারদের বাক্য চিন্তা করিতেছেন, আবার প্রাণনাথের অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠায় সে সকল বিস্মৃত হইয়া, অনিমেষলোচনে বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে "আমার প্রাণ যায়" এই শব্দ তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। সাবিত্রী শশব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অনতিদূরে দেখিলেন, সত্যবান্ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কাতর স্বরে "আমার প্রাণ যায়" এই কথা বলিতে বলিতে আসিতেছেন।

সাবিত্রী স্বামীর এই ক্লেশকর অবস্থা দেখিয়া দ্রুতপদে তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করাইয়া তাঁহার ক্লেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু শরীরের অবসাদ ও যন্ত্রণা প্রযুক্ত তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না।

প্রবল যন্ত্রণায় তাঁহার শরীর অবসন্ন ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া আসিল। তাঁহার এই প্রাণান্তকাল উপস্থিত দেখিয়া সাবিত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অতিকষ্টে মনের দুঃখ মনোমধ্যে রাখিয়া কি উপায়ে প্রাণনাথের প্রাণ রক্ষা করিবেন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে। যদি দেবর্ষির বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে প্রাণবল্লভের মৃত্যুকাল সমাগত, তাহার সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া সাবিত্রী দুর্ব্বিষহ শোকদহনে বিচেতনপ্রায় হইলে, দেবর্ষি নারদের অনুকূল বাক্য তাঁহার স্মরণ হইল। এমন সময়ে বনের দক্ষিণ দিকে জনকোলাহলের ন্যায় অস্পষ্ট শব্দ তাহার শ্রবণগোচর হইল। তিনি ঔৎসুক্য সহকারে সেই দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কিয়দ্দূরে এক মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, লোহিতাম্বর পরিধান এবং মস্তকে মুকুট ও হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া, বিকটাকৃতি দূতগণ সমভিব্যাহারে সেইদিকেই আগমন করিতেছেন। ইঁহারা যম ও যমদূত। সাবিত্রী সেই নিবীড় বনমধ্যে একাকিনী মৃতকল্প পতিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। শোকে ও দুঃখে তাঁহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতেছে। যম ও যমকিঙ্করদিগের

সেইরূপ ভীষণ আকৃতি দর্শন করিয়াও তাঁহার মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। ক্রমে সেই মহাকায় পুরুষ সাবিত্রীর নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যম আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন"—তোমার প্রিয়পতি সত্যবানের জীবনকাল সমাপ্ত হইয়াছে, এজন্য আমি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি।" যমের এই হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাবিত্রীর হৃদয় কম্পিত ও নয়নযুগল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পতির জীবনরক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে যমকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন।

সাবিত্রীর সেই দুঃখজনক বাক্যে যম কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার মুমুর্ষু পতির জীবন গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী আর্য্যপুত্রের প্রাণান্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বনচারী বিহঙ্গগণও যেন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু যমের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দয়ার উদ্রেক হইল না।

সাবিত্রী যমের এই নির্দ্দয় ব্যবহারে পরিতপ্ত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, স্বামিহীন স্ত্রীর জীবনে কোন সুখেরই প্রত্যাশা নাই, কেবল দুঃখময় দেহভার বহন করা মাত্র। অতএব পতির অনুগমন করিয়া, এ দুঃখভারাক্রান্ত পাপ জীবনের লীলা সংবরণ করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া সাবিত্রী কাতরস্বরে রোদন করিতে করিতে যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। যম সাবিত্রীর ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বিলাপবাক্যে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে কতিপয় বর প্রদান করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে সাবিত্রী এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমার শ্বশুর অন্ধত্বমুক্ত ও স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করুন। দ্বিতীয় বর এই যে, আমার পিতা দীর্ঘজীবী ও শত পুত্র প্রাপ্ত হউন। তৃতীয় বর এই চাহিলেন যে, সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হউক। পরিশেষে যমরাজ সত্যবানের চারি শত বৎসর জীবনধারণের বর প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রী যমরাজের প্রসাদে এই সকল অভীষ্ট বর লাভ করিয়া কৃতার্থ ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া পতি সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

আশ্রমবাসী মুনি ও ঋষিগণ সাবিত্রীর মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং তদীয় পতিপরায়ণতার কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ সাবিত্রি! তোমার এই অমানুষিক কার্য্য দ্বারা তুমি পিতৃকুলের গৌরববৃদ্ধি, এবং বিনাশোন্মুখ শ্বশুরকুলের পুনরুদ্ধার সাধন

করিলে, তোমার নারীজন্ম ও জীবনধারণ সার্থক হইল। তুমি পতিপরায়ণতা-গুণে ধরাতলে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলে। তোমার এই পতিপরায়ণতা স্ত্রীজাতির আদর্শস্বরূপ হইল।" সমাগত ঋষিগণ সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই উপাখ্যানে সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের শৈব্যা, সত্যবানের সাবিত্রী, নলের দময়ন্তী, শ্রীবৎসের চিন্তা, রামের সীতা আবহমান কাল স্ত্রীজাতির আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে। যে সংসারে দাম্পত্যপ্রেম অটলভাবে বিরাজ করে, সেখানকার সুখের তুলনায় অতুল ঐশ্বর্য্য অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে সংযত থাকিয়া পর দিবস চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাবিধি সাবিত্রী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এই সাবিত্রী ব্রত চতুর্দ্দশ বৎসর নিষ্পাদ্য। এই ব্রতে চতুর্দ্দশটী ফল, চতুর্দ্দশ খানি নৈবেদ্য, তদ্রূপ পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও ভোজ্যাদি বিধিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিতে হয়।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।

শিক্ষা।*

ধর্ম্মজ্ঞান, বুদ্ধিবিকাশ, চরিত্রসংশোধন, শিল্প বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচক্ষণতা প্রভৃতি মানবমাত্রেরই থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই গুলি লাভ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বকালে ইউরোপের জনসাধারণ অত্যন্ত অশিক্ষিত ছিল, সুতরাং বৃক্ষ বা শিলাখণ্ডকে দেবতা মনে করিয়া তাহারই আরাধনা করিত। মহাত্মা যীশু সেই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের নিকট তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলে তাহারা কুপিত হইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করে। শিক্ষা দ্বারা সেই নির্ব্বোধেরা আপনাদিগের অন্যায় আচরণ বুঝিতে পারিয়া পরে অনুতপ্তহৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মবিষয়ে কত জ্ঞানলাভ হয়, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে এতদ্দেশীয় লোকও অজ্ঞ ছিল। তাহারা মনে করিত, স্ত্রীলোকেরা মৃত পতির চিতায় আরোহণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেই তাহাদিগের ধর্ম্ম হয়। পুণ্য হইবে ভাবিয়া তাহারা স্নেহ মমতা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন

* একাদশবর্ষীয়া বালিকার রচনা।

করিত। সুশিক্ষিত মহাত্মা "লর্ড ওয়েলেস্‌লি" ও "লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক" বহুযত্নে এই ঘোরাবহ নৃশংস প্রথাগুলি রহিত করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তানও এই মহৎকার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে কত উন্নতি সাধিত হয়।

শিক্ষাপ্রভাবে লোকে শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ে দিন দিন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বকালের লোকে সাহিত্য ও গণিতাদি শাস্ত্রে অশিক্ষিত ছিল, তথাপি তাহারা শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করিত না। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার স্বচক্ষে বাঙ্গালার অবস্থা দুইবার প্রত্যক্ষ করিয়া স্বদেশে যে পত্র লিখেন, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালা হইতে বহুল পরিমাণে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ইউরোপ প্রভৃতি দূরদেশে রপ্তানি হইত। তখন সুগম পথ বা প্রধান নগর হইতে কিছুদূরে গমন করিলে এমন স্থান পাওয়া যাইত না, যেখানে প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী, বালক বালিকা বস্ত্রনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন এতদ্দেশীয় শিক্ষিত লোকে শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াও এমনই বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন, যে, শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ে এখন বঙ্গের আর পূর্ব্ববৎ অবস্থা নাই। স্বদেশে সুলভ উৎকৃষ্ট বস্ত্র হইত না বলিয়া আমরা বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিতেছিলাম। ঘরে ঘরে আর চর্কা ঘুরিত না। শিক্ষার যদি এইরূপ উপকারিতা হয়, তবে এ শিক্ষায় শরীরপাত করিয়া ফল কি? ভগবৎকৃপায় সম্প্রতি সুশিক্ষার ফলে আমাদের দেশের এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে।

জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান না থাকিলে লোক কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। জ্ঞানিগণ কত আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে পৃথিবীর সমুদায় লোকই অশিক্ষিত ছিল, সুতরাং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে জ্ঞানরত্ন লাভ হয়, তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহারা তখন বস্ত্র পরিধান করিত না, কেহ কেহ নগ্নাবস্থায় থাকিত, কেহ কেহ শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার্থ ব্যাঘ্র বা অন্য পশুর চর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া রাখিত। ক্রমে লোক যতই শিক্ষিত হইতেছে, ততই জ্ঞানলাভ করিতেছে। পূর্ব্বে এমন সময় ছিল, যখন লোকে খড় দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত, কিন্তু তাহা অল্প দিন পরেই পচিয়া যাইত। এখন লোকে বুদ্ধিবলে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছে এবং বিদ্যুৎ হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে তদুপরি লৌহদণ্ড

স্থাপন করিতেছে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষা দ্বারা লোক বিবিধ প্রকারে উপকার পাইতেছে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রসংশোধন। যে ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়াও সচ্চরিত্র না হয়, যে ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়াও স্বীয় কুটিলতাপূর্ণ খল স্বভাব পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহার শিক্ষাতে কোন ফল হয় নাই। শিক্ষাতে যদি চরিত্রই সংশোধিত না হইল, তবে শিক্ষাতেই বা ফল কি? সচ্চরিত্র হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য কিরূপে ভাল থাকে, শরীর কিরূপে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা জানিয়া যতদূর পারা যায় শরীর নীরোগ রাখিবার চেষ্টা করাও শিক্ষার একটী উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে বিদ্যাশিক্ষাতে কোন ফল হয় না। এতদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অধিক পরিমাণে পড়াশুনায় নিবিষ্ট থাকেন বলিয়াই তাঁহারা রুগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকে কিরূপে শরীর বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হয়, তাহা লিখিত আছে। ছাত্রগণ যদি সেই সকল পুস্তক পাঠ ও তদনুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলেই তাহাদের শরীর সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, শিক্ষাদ্বারা লোক জ্ঞানলাভ করিয়া সুস্থ শরীরে জগতের কত মঙ্গল সাধন করিতে পারে।

রন্ধন, শিল্প, গৃহকার্য্য, সন্তানপালন প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাহাদের শিক্ষা করা উচিত। এখন পাকপ্রণালী, গৃহকার্য্য ও শিশুশিক্ষা-বিষয়ক অনেক পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকগণ যদি সেই সকল পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রন্ধনকরা সামগ্রী বলকারক ও পুষ্টিকর হইবে এবং তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষাদ্বারা যেমন পুরুষদিগের সেইরূপ স্ত্রীলোকদেরও যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। শ্রীপ্রিয়বালা কর।

শিলং বঙ্গ বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী।

প্রেম।

মায়াবাদীর নিকট এই জগৎ সংসার মায়াময় মিথ্যা। "এই সংসারের কেহই তোমার নহে, তুমিও কাহারও নহ। এই যে সংসারে বিচিত্র প্রেম সম্বন্ধ দেখিতেছ, ইহা তোমার বন্ধন-রজ্জু। কাহারও প্রেমে ধরা দিয়ো না, এ সকলই অসত্য।" মায়াবাদিগণ এই ভাব জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরাও কত সময় আত্মীয়-স্বজন-বিচ্ছেদে কাতর বন্ধুবান্ধবগণকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া, এই ভাব

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে মহিলাসমিতির অধিবেশনে পঠিত।

প্রচার করিয়া থাকি। যখন সংসারে নানা প্রকার ক্লেশে কাতর হই, যাঁহাদের প্রতি আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি, তাঁহাদের ব্যবহারে সকল আশা নিরাশায় পরিণত হইয়া থাকে; তখন বিরাগ-বিক্ষুব্ধ অন্তরে আমরাও এইরূপ চিন্তা দ্বারা নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিতে যাই। কিন্তু সত্যই কি এই জগৎ মায়াময় মিথ্যা? পিতা মাতা আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব কেহই আমার নহে? এত স্নেহ, এত ভক্তি, এ সকলই মিথ্যা? যখন ইহলোক হইতে অবসৃত হইব, তখন সত্যই কি এ সকল সম্বন্ধ সমূলে ছিন্ন হইবে? মানব-হৃদয়-নিহিত প্রেম কি মিথ্যা-মায়া-প্রসূত?

প্রেম কি? প্রেম যদি মিথ্যা-মায়া-প্রসূত হয়, তবে সত্য কি? যে প্রেম সংসারে সৃষ্টি স্থিতির মূলকারণ, সেই প্রেম যদি মিথ্যা মায়া হয়, তবে কিরূপে এত বড় অসত্যের উপর সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা অসত্য, যাহা মিথ্যা, তাহা কি সৃষ্টি স্থিতির মূলকারণ হইতে পারে? কখনই নহে।

তবে কেন মায়াবাদিগণ ইহাকে মিথ্যা মায়া বলিয়া গিয়াছেন? তবে কেন আমরাও সময় সময় ইহাকে অসত্য বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে যাই? যখন ধীর ভাবে চিন্তা করি, তখন দেখি ইহা বিকৃত চিন্তার ফল মাত্র।

পরাৎপরে বিধাতা মানবের অন্তরকে সহজ ভাবেই প্রেমপ্রবণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। শিশু জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসিতে আরম্ভ করে। যতই বড় হইতে থাকে, ততই তাহার প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। মানবাত্মা যতই সেই পরাৎপরের সংস্পর্শে আসিতে থাকে, তাহার প্রেমও ততই বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা কত মহাত্মার জীবনে দেখিতে পাই। কত সংসার-তাপ-দগ্ধ আত্মা জগৎকে অনিত্য অসার ভাবিয়া এই সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু তাহার শুষ্ক তৃষিত আত্মা যখন প্রেম-ময়ের প্রেমরসপানে সরস হইয়া উঠে, তখন সংসারের প্রতি বিদ্বেষভাব আর তাহার অন্তরে স্থান পায় না। তখন বিশ্ব-জগৎ তাহার একান্ত আপনার হইয়া যায়। জগতের দুঃখ ও দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহার নিকট এই সৃষ্টি আর তখন মায়াপ্রসূত অসত্য নহে। তখন ইহা তাহার অন্তরের প্রিয়তম দেবতার সংসার। তাই সে এই সংসারের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন উৎ-সর্গ করিয়া থাকে।

আমরা দেখিতেছি মানবহৃদয়ে প্রেম স্বাভাবতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রেমহীন জীবন জলহীন নদীর ন্যায়। যে নদীতে জল নাই, তাহার নদী নাম যেমন নিরর্থক, যে মানবের জীবনে প্রেম নাই, তাহার জীবনও তেমনি নিরর্থক। প্রেম স্বাভাবিক, সরল, পবিত্র, সুন্দর। ইহা যে জীবনে যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয় সে জীবন ততই পবিত্র ও সুন্দর হয়।

সংসারে আমরা কত সময় অপবিত্র

প্রেম এই নাম শুনিতে পাই। প্রেম কখনও অপবিত্র হইতে পারে না। লোকে যাহাকে অপবিত্র প্রেম বলে, তাহা প্রেম নহে, আসক্তি। যখন মানবের অন্তশ্চক্ষু মোহাবরণে আচ্ছন্ন এবং আসক্তিজালে জড়িত থাকে, তখন এই আসক্তিকে প্রেম বলিয়া ভুল করে। প্রেম চির-শুভ্র, চির-পবিত্র। কোনও প্রকার মলিনতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন আলোকের অভাবই অন্ধকার, পুণ্যের অভাবই পাপ, অন্ধকার ও পাপ বলিয়া পৃথক্ বস্তু নাই, তেমনি পবিত্র প্রেমের অভাবই আসক্তি। আমরা এই আসক্তিতে ডুবিয়া থাকি বলিয়া, যখন দেখি আসক্তিতে প্রাণ তৃপ্ত হয় না, যাহাদের প্রতি আসক্ত আছি, তাহারা আমার প্রতি বিমুখ, তখন আমাদিগের চিত্ত বিরাগে বিক্ষুব্ধ হইয়া শুষ্ক হইয়া উঠে। তখনই আমরা মনে করি এই সংসারে কেহই আমার নহে, আমিও কাহারও নহি। এ সকল সম্বন্ধ মায়াময় মিথ্যা। মানবচিত্ত যখন আসক্তি গরলে জর্জ্জরিত হইয়া বিকৃত অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই মন এইরূপ ভাবিয়া থাকে।

মানবের অন্তরে বিধাতা প্রেমের উৎস নিহিত রাখিয়াছেন। উৎস পর্ব্বত-গাত্র হইতে উৎসারিত হইয়া যতই স্বীয় শক্তিপ্রভাবে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে থাকে, ততই তাহার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেইরূপ মানব তাহার জীবনের প্রেম-উৎসকে কার্য্যসাধনে নিয়োগ করিলে, তাহার প্রেম-উৎসও ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া তাহার নিজের জীবনকে সরস রাখে ও অপরের জীবনের সহিত মিলিত হইয়া দিন দিন মানব-জীবনকে সরস এবং সুফলপ্রসূ করিয়া তোলে। অপর পক্ষে যে মানব নিজ জীবনের প্রেম-উৎসকে কার্য্যসাধনে নিয়োগ না করিয়া, তাহাকে স্বার্থের আবর্জ্জনাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার জীবন নীরস শুষ্ক মরুতুল্য, আসক্তিরূপ তপ্ত সৈকতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আসক্তি জীবনকে শুষ্ক, কঠোর ও স্বার্থপর করে এবং যা কিছু এইরূপ শুষ্ক জীবনের সংস্পর্শে আইসে, তাহাও শুষ্ক নীরস হইয়া যায়। শুষ্ক বালুকা যেমন অনুর্ব্বর, তেমনি আসক্তিপূর্ণ জীবনও অকর্ম্মণ্য এবং বিফল।

বিধাতৃদত্ত দিব্য প্রেম নর নারী সকলের অন্তরেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, পুরুষোচিত কতকগুলি প্রবৃত্তি পুরুষজীবনে সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়; আবার কতকগুলি কোমল প্রবৃত্তি নারীজীবনে সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। নারীপ্রকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি অপেক্ষা অধিকতর কোমল। এই জন্যই নারীজীবনে যখন এই পবিত্র প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই, তখন যেন পুরুষজীবন অপেক্ষাও নারীজীবনে ইহার বিকাশ অধিকতর সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। রাবেয়া, মীরাবাই প্রভৃতি ভক্তিমতী নারী-গণের জীবনে আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে

পাই। পক্ষান্তরে নারী যদি প্রেম-হীনা হন, তবে তাঁহার জীবন আসক্তি-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রেমহীন পুরুষ-জীবন অপেক্ষাও অধিকতর কুৎসিৎ হইয়া উঠে। যে কেহ এইরূপ জীবনের সংস্পর্শে বাস করে, তাহার জীবনও আসক্তিরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমরা নিত্য দেখিতে পাই।

প্রেম নিত্য ও চিরস্থায়ী। ইহার নিকট ইহকাল পরকালের ব্যবধান নাই। প্রেমই ইহলোকবাসী ও পরলোকবাসীর মিলনের সেতু।

মানবাত্মা প্রেমময় পরমাত্মার সন্তান। যখন মানবাত্মা পরমাত্মার পিতৃত্ব ও নিজের সন্তানত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করে, তখন তাহার হৃদয় বিশ্বজনীন প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে। সে হৃদয় আর দেহ-নাশজনিত বিচ্ছেদশোকে কাতর হইয়া পড়ে না। তাহার নিকট ইহকাল পর-কালের ব্যবধান নাই। তাহার নিকট আত্মপর জ্ঞান নাই। বিশ্বজগতের সঙ্গে মধুময়, শুদ্ধ, পবিত্র প্রেম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাহার মানবজীবন সার্থকতা লাভ করে।

এই সার্থকতা লাভই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া এই সার্থকতা লাভ করিতে হইবে। এই পথ সহজ সরল ও স্বাভাবিক। যদি আমাদিগের এমন দুর্ভাগ্য ঘটে যে, এই সহজ পথে না গিয়া বক্র পথে কুটিল-গতিতে আমরা সুখ খুঁজি, তবে সুখ তো পাইবই না, বরং ঐ সহজ সরল পথ খুঁজিয়া পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। এই সহজ, সরল, স্বাভাবিক শিব সুন্দর প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া আমাদিগের মানবজীবন সার্থক হউক।

ভূত না মানুষ ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চণ্ডদেব।

পুরমণ্ডল গ্রামে চণ্ডদেব আজ কাল একজন প্রধান লোক। ধনে, মানে, রূপে, বুদ্ধি ও প্রতিভাতে এবং দয়াধর্ম্ম, ক্ষমা, সৌজন্য ইত্যাদি গুণে গ্রামের মধ্যে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। তাহার পূর্ব্বনিবাস পুরমণ্ডলে নহে। চণ্ডদেবের পিতা রাজপুতানা হইতে আসিয়া পুর-মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নানা দ্রব্যাদি, দাস, দাসী ও অনেক অর্থ ছিল।

রাজপুতনাতেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পর একজন বিধবা

রাজপুতমহিলাকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধবার ও নিজের সন্তান সন্ততি ছিল। পুরমণ্ডলে তাহার মৃত্যু হয়। চণ্ডদেবের পিতা পুরমণ্ডলে আসিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু উপার্জ্জিত টাকার সুদের পিপাসাটা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী ছিল। তজ্জন্য তিনি বহুলোকের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডদেব পিতার মৃত্যুর পর টাকার সুদ একেবারেই কমাইয়া ফেলিয়াছেন। পরন্তু তিনি বিনা সুদেও অনেককে টাকা ধার দেন; এবং দীন দরিদ্রদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ দান করেন। চণ্ডদেব লোকের সুবিধার জন্য গ্রামে চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং জলাশয় খনন করাইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সমস্ত পুরমণ্ডল-গ্রামবাসীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। চণ্ডদেবের বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। কিন্তু তিনি শিবপূজা, সন্ধ্যা ও জপ সমাধান না করিয়া কদাপি জলগ্রহণ করেন না।

চণ্ডদেব বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও পবিত্র বলিয়া গ্রামের সকলেই জানে। তিনি কখনও স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করেন না। নিশীথে কখনও গৃহের বাহির হন না। তিনি মৎস্য, মাংস, পান ও তামাক পরিহার করিয়াছেন। ঘৃত, সৈন্ধব ও আতপান্ন তাঁহার আহার। তিনি কুশাসনে শয়ন করেন ও সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল কারণে গ্রামের লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে। টাকা আদায় ও দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য চণ্ডদেবকে মাসে দুই এক বার মফঃস্বলে যাইতে হয়; এবং অনেক সময় গ্রামের বাহিরেও থাকিতে হয়।

যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া আপন গৃহে বসিয়া পাঠ করেন। চণ্ডদেব বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার শরীর ব্যাধিশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পুরমণ্ডলে আসিবার পর তাঁহার একটী ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ পথে বা মাঠে একাকী ও নির্জ্জন থাকিলেই এক কৃষ্ণকেশধারী ভূত তাঁহার নিকট আসে ও তাঁহাকে কোনও একটী বস্তুর দ্বারা আঘাত করিলে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কিন্তু এ কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া গোপনে রাখিয়াছেন। গোপনে তিনি অনেক ঔষধ সেবন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই।

চণ্ডদেবের পিতা পুরমণ্ডল গ্রামে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আরও একটী সন্তান রাজপুতানায় রহিয়াছে। কিন্তু চণ্ডদেব তাহার কোন অনুসন্ধান করিতেন না। গ্রামবাসিগণ এইটি চণ্ডদেবের অন্যায় কাজ বলিয়া মনে করিত।

এখন পাঠকপাঠিকাকে একবার আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নন্দকের নিকট যাইতে

হইতেছে। নন্দক বরাহপুর হইতে যাত্রা করিয়া সেই রমণীর কুটীরে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হয় নাই; কিন্তু তপনদেব অস্তাচল শিখরে তখন লুক্কায়িত হইয়া দিগ্‌দিগন্তব্যাপী স্বর্ণের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া লইতেছেন। আদিত্যকে বিদায় দিয়া নিরানন্দ প্রকৃতিদেবী নাতিশীতোষ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছেন। উজ্জ্বল আলোক সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার তখনও সমস্ত গ্রাস করিতে পারে নাই। কোন কোন বৃক্ষের শিরে এখনও সোণালী রঙ্গের আভাস পাওয়া যাইতেছে। নন্দক কুটীরের নিকট গেলেন। কুটীরের দরজা মুক্ত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কুটীরবাসিনী রমণীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি কুটীরের অতি নিকটে গেলেন। কুটীরের সম্মুখে কতকগুলি লালফুল বিকশিত হইয়া অবনত হইয়া রহিয়াছে। দুই একটী প্রজাপতি এখনও সেই সদ্যবিকশিত লাল ফুলের স্তবক স্পর্শ করিবার আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি সে দিকে মনোযোগ না করিয়া ত্রস্তভাবে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুটীর মনুষ্যহীন, তিনি পূর্ব্বে মাটীর নিম্নের গৃহে গিয়াছিলেন, তাহাতে গমনপথের সন্ধান জানিতেন। অতএব নীচের ঘরে নামিয়া গেলেন; কিন্তু সেখানেও কুটীরবাসিনী রমণী বা তাঁহার ভগিনীর মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন না। ঘরের সামগ্রীগুলি যেমন দেখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই দেখিতে পাইলেন; কেবল সম্মার্জ্জনীটী স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা স্থানান্তরিত হওয়ায় চিত্রটী স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। এই প্রতিমূর্ত্তি চণ্ডদেব ব্যতীত আর কাহারও নহে। তিনি এই সকল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বিষন্নমনে ভাবিতে লাগিলেন:—

এ কি? একি প্রহেলিকা? না, কখনই না; অথবা প্রহেলিকা ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। তখন তাহার সেই বালিকার কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সে বলিয়াছিল "এ সব ভূতের কার্য্য।" তবে কি ইহা তাহাই? না, ভূত কিরূপে সম্ভবে? তবে কি কোন মানুষ ইহা করিয়াছে? হাঁ তাহাই। না এরূপ মানুষ ত কোথাও দেখিতে পাই নাই। তবে বোধ হয় সে চক্ষের অগোচরে থাকিয়া এ সকল কার্য্য করিয়াছে। ভূতই হোক্, মানুষই হোক্, আর দেব দানবই হোক্, পরের অনিষ্টসাধন করিয়া আত্মগোপন করিতে পারিবে না।

পাপ করিয়া আত্মগোপন করা মূর্খতার কার্য্য। যে মূর্খ পাপ করিয়া পাপ গোপন করিতে চায়, সে কূপ খনন করিয়া তন্মধ্যে আপনাকে আপনি নিক্ষেপ করে। স্বর্গীয়া ভগিনীর প্রমুখাৎ চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে অনেক বিষয় শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় নাই। আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই অথবা তাহা বিশ্বাস করিবার আমার অধিকার নাই। কারণ,তিনি আমাদের প্রতিপালক,

এবং অতিশয় সৎপ্রকৃতির লোক। তাঁহা দ্বারা এবম্বিধ কার্য্য সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অতএব এ কথা আমি কখনও বিশ্বাস করিব না। প্রকৃত দোষীর অনুসন্ধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এমন কি, ইহাতে যদি আমার প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাতেও আমি প্রস্তুত। আমি এ বিষয়ে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

নন্দক উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া এক লম্ফে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পুরমণ্ডলগ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথের দুই দিকে ঘন নিবিড় বন, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবীথিকা ও কুঞ্জকাননে পরিশোভিত মাঠ পরিলক্ষিত হইতেছিল। যখন তিনি পুরমণ্ডলে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন সবেমাত্র প্রত্যুষ চলিয়া গিয়াছে। দিবসের প্রথম প্রভাত-কাল ঈষৎ লালবর্ণের আভাযুক্ত শুভ্র স্থলপদ্মবৎ লোহিত কিরণচ্ছটার সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া মধুর শোভা ধারণ করিয়াছে। মস্তকোপরি বিস্তীর্ণ নীলা-কাশ, শান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির ও অচল। দিগ্‌দিগন্তে বনে জঙ্গলে, মধুময়ই হউক, অথবা নাই হউক, সরসই হোক্ আর নীরসই হউক, তৎকালে সমস্ত ফুলই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বায়ু পরিষ্কার, শীতল ও স্থির।

তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিপালক চণ্ডদেবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডদেব একাগ্রমনে স্তবপাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ধনুকের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুন্দর চক্ষু কোটরা-বৃত হইয়াছে। তিনি নন্দককে ডাকিলেন। সে তাহার কাছে গেল, কিন্তু নন্দক আজ উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মহারা।

চণ্ডদেব। "চন্দনাকে কি কোথাও দেখিলে? সে আমার সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহে বাস করে; আমি তাহার রক্ষক, কিন্তু তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না; সে কোথাও নাই। জগতে আছে কিনা তাহা জানি না। এই ঘটনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; সে আমা-দের বড় আদরের ছিল, তাহার নবীন বয়স, এবং সে অসাধারণ গুণবতী ও অপূর্ব্ব সুন্দরী। আহা! কোন্ নির্দ্দয় এমন জিনিষ নষ্ট করিল?"

চণ্ডদেবের গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। নন্দকের চক্ষু অশ্রুশূন্য, কিন্তু তাহার দুঃখ ক্রন্দনের অতীত। সে সন্দেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চণ্ডদেবের মুখে কি অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কম্পিত অথচ গম্ভীর স্বরে কহিল "হাঁ। দেখিয়াছি। দেখিয়াছি!"

"কি বল! কোথায় দেখিলে? বল, বল, এই হতভাগাকে পুনর্জ্জীবিত কর।" এই বলিয়া চণ্ডদেব ব্যাকুলভাব দেখাইতে লাগিলেন।

নন্দক। "ভগিনীকে দেখি নাই, কিন্তু পথিমধ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়াছি।" নন্দকের স্বর কম্পিত ও অস্পষ্ট।

"মৃতদেহ!" চণ্ডদেব আসন হইতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মৃতদেহ!"

নন্দক। "হাঁ আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে।"

"মৃতদেহ! হায় কে, কোন্ শত্রু এ কার্য্য করিল? কিছুই ত জানি না। আশা ছিল পাইব, আজ তাহাও নির্ম্মূল হইল।" এই বলিয়া চণ্ডদেব নীরব হইলেন; তাঁহার নয়ন সজল ও বদন মলিন হইল।

নন্দক মনে মনে কহিল, "কিছুই ত জানি না, কিছুই ত দেখি নাই, তবে এই-মাত্র জানি যে, আমারও শত্রু আছে। আর যাহা দেখিয়াছি তাহা কেবল মৃত-দেহমাত্র। কিন্তু দেখিব, জানিব, চিনিব কে আমার শত্রু, কে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে? যদি আমি ইহার গূঢ় রহস্য-ভেদে পরাঙ্মুখ হই, তবে আমার পুরুষ নাম বৃথা। চণ্ডদেব, চণ্ডদেব, ইনি চণ্ডদেব, ইঁহার বিরুদ্ধে স্বর্গগতা ভগিনীর নিকট অনেক কথা শুনিয়াছি। যদিও তিনি আমাদিগকে স্নেহময় ভ্রাতা ও পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন, যদিও ইঁহার স্নেহে আমরা সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি, তথাপি ভগ্নীর বাক্য আমার প্রাণে বিঁধিয়া রহিয়াছে, আমি দেখিব ইনি প্রকৃত সাধু না ভণ্ড।"

কিন্তু পরক্ষণেই এই ধর্ম্মশীল যুবকের দৃষ্টি চণ্ডদেবের উপর পতিত হইল। তিনি দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। সসঙ্কোচে চক্ষু অবনত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে আমি কখনও হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। এ কাজ চণ্ডদেবের নহে। ভগ্নীর প্রাণ-নাশককে খুঁজিতে গেলে যদি আমাকে চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়, তবে এ কাজ স্থগিত থাকুক।" কিন্তু পরক্ষণেই আবার চন্দনার সেই কোমল অথচ দৃঢ় স্বর তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। "চণ্ডদেব, তুই আমার ও আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্, ভাবিয়াছিস্ তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। না, তাহার একটী কথাও ভুলি নাই।"

নন্দক এইরূপ নানা চিন্তায় অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিলে সে আবার চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে মনে মনে সঙ্কল্প করিল। চণ্ডদেবকে কোন কথা না বলিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। "যে নিজে নিজেকে সহায়তা করে, ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন।" এই কথাটী স্মরণ হওয়াতে সে সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ চণ্ডদেবের তৎ-কালীন অবস্থায় কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে কথোপকথন না করাই উচিত বলিয়া সে বুঝিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

হরিণাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে যে মহিলা-সভা হয় তাহার বিবরণ।

বিগত ৭ই ফাল্গুন হরিণাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তত্রত্য জমিদার ৺নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের যে সভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র ও তাঁহার কন্যা কুমারী কুমুদিনী মিত্র যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র বলিলেন,—

আজ এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এতগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত একত্র মিলিত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আজ যেমন আপনারা এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন, এইরূপে যদি আপনারা মধ্যে মধ্যে সকলে একত্র হইয়া নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, অথবা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বা অন্য অন্য ধর্ম্মগ্রন্থ, কিম্বা মহাজনদিগের জীবনী কিছুক্ষণ কেহ পাঠ করেন, এবং কেহ বা সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার মনে হয় এই দেশের অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের অনেকটা উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে সকল দেশের নারীরাই তাঁহাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এখন আর কেহই শুধু সংসারের কাজ করিয়া ও গল্প করিয়া বৃথা সময় কাটাইতে ইচ্ছুক নহেন; নারীদেরও জীবন যে মহৎকার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এ ভাব তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছে। দেখুন পাশ্চাত্য দেশের নারীরা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের উন্নতি-সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন অল্পাধিক পরিমাণে সকল দেশের নারীদিগেরই উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। কেবল আমাদের বঙ্গদেশের নারীরাই মৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। এখন আর আমাদের এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না; আসুন, সকলে মিলিয়া আমরাও আমাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি ও সেই পথে অগ্রসর হই। এখন সেই সময় আসিয়াছে, এখন আর বঙ্গনারীদিগের এরূপ ভাবে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকা ভাল দেখায় না।

আমাদের সম্মুখে এই যে বৃহৎ স্তম্ভ রহিয়াছে, এই স্তম্ভের কি কোনও শক্তি আছে? এ একটা জড় পদার্থ, ইহার কোনও শক্তি থাকিতে পারে না। সেইরূপ আমরা যদি জড় পদার্থের অর্চ্চনা করি, তাহা হইলে আমাদের যে কোন কালে কিছু হইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। জগদীশ্বরের দিকে তাকাইয়া, জগতের মধ্যে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, আমাদিগকে তাঁহার সেই মহান্ দৃষ্টান্ত ধরিয়া জীবন গঠিত করিতে হইবে ও

জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। নারীগণই মানবজীবনগঠনের প্রধান সহায়। নারীদিগের জীবনের উন্নতি হইলেই পুরুষদিগের ও দেশের উন্নতি হইবে।

অতঃপর কুমারী কুমুদিনী মিত্র বঙ্গদেশের নারীগণ কি কি কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করেন। এলাহাবাদে শ্রীমতী সরলাদেবী প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্থাপিত ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "এইরূপ একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতের স্ত্রীজাতিকে লইয়া একটী মালা গাঁথা হইবে। প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়া নারী তাহার এক একটী ফুল স্বরূপ।

ভারতমহিলাদের সকল বিষয়ে যাহাতে উন্নতি হয়, এই স্ত্রীমহামণ্ডল সমিতি তাহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা একটী ভাণ্ডার খুলিয়াছেন, তাহাতে মহিলারা যে কোন শিল্প কার্য্য কিম্বা প্রবন্ধাদি বা কোনও গ্রন্থ লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহা উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারা কিনিয়া লইয়া প্রকাশ করিবেন। প্রাচীন কালের মহিলা-শিল্পের যাহাতে পুনরুদ্ধার হয়, তাহারও চেষ্টা করিতেছেন। এই সভার সভ্য হইতে যদি কাহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বৎসরে এক টাকা চাঁদা ও প্রবেশ করিবার সময় এক টাকা প্রবেশ-ফি দিতে হয়। আপনারা যদি ইহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে লিখিলে আমি আপনাদের নাম সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারি। এই মহামণ্ডল-সমিতি অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনারা যদি এইরূপ শিক্ষয়িত্রী চান, তাহাও পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। এই সমিতির উক্ত ভাণ্ডার হইতে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হইবে, সেই সকল দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা দরিদ্র ও দুঃস্থ অনাথ অনাথাদের সাহায্য করা হইবে।"

তিনি পরে বলেন, "কলিকাতায় বঙ্গমহিলাদিগের উদ্যোগে তিন চারিটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ও তাহা দ্বারা অনেক অনাথ পরিবারের সাহায্য ও সকল বিষয়ে উপকার করিবার চেষ্টা হইতেছে।" তৎপরে হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত মহিলাশিল্প-সমিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "অনেকগুলি বিধবা তথায় তাঁত, জামা, মোজা, লেশ্ প্রস্তত করণ প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। পরে যাহাতে তাঁহারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

এই সকল বিষয় শুনিয়া মহিলাদিগের মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহের ভাব দেখা গেল। কতকগুলি প্রাচীনা নারী বলিলেন যে, আপনাদের কথা সকলই ভাল লাগিল ; কিন্তু আমাদের পুরুষেরা আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধা দিবেন। আপনাদের যেমন উৎসাহ দিবার লোক আছে, আমাদের তাহা নাই, ইত্যাদি।

তৎপরে কুমদিনী মিত্র তাঁহাদিগকে ছাঁচ, বড়ী, সিকা প্রভৃতি প্রাচীন শিল্প যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ঐ ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন ও বলেন "আপনারা সকলে মিলিয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করুন। যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাদিগকে জানাইলে এখানে আসিয়া আমরা আপনাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া যদি কার্য্য করিতে না পারেন, প্রত্যেক পল্লীতে ২।৪ জন মিলিত হইয়া অবসর-সময় যে যাহা জানেন তাহা যদি অন্যকে শিখান, কিম্বা কিছুক্ষণ ভাল গ্রন্থ পড়েন, তাহা হইলেও অনেক উপকার হইতে পারে।"

বাস্তবিক আমাদের দেশের প্রত্যেক নারী যদি প্রতিবাসিনী, ভগ্নী ও কন্যাদের মঙ্গলের জন্য কিছু কাল এই পথের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে এই পতিত বঙ্গদেশের অনেক উন্নতির আশা হয়। পুরুষদিগেরও তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভালবাসা ও ভক্তি।

ভালবাসা এই নীরস মরুময় সংসারক্ষেত্রে একটা সুন্দর-সৃষ্টি, শুষ্ক নদীবক্ষে নির্ম্মল জলপ্রপাত, কণ্টকাকীর্ণ মৃণালে সুন্দর কোমল চিত্তবিমোহন পদ্ম।

সঙ্কীর্ণ মানবহৃদয়ে ইহার উৎপত্তি বটে, কিন্তু ইহার সহিত তুলনা হয়, জগতে এমন পদার্থ আর নাই। এই সুন্দর পদার্থ যে কি, কোন কবি বা কোন দার্শনিক তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে পারেন নাই, বরং ইহাকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত রূপ বর্ণনা দুঃসাধ্য, ইহা চিন্তার অতীত, ভাষার অতীত, ইহা এক স্বর্গীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত রহিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কোন বিষয়ের বর্ণনা দেখা যায়, তাহা পার্থিব, যাহা স্বর্গীয় তাহার বর্ণনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ভালবাসা এই নীরস উত্তপ্ত সংসারক্ষেত্রে মধুর স্নিগ্ধ শান্তির বীজ বপন করে ও তাহার নির্ম্মল সূত্রে এক হৃদয়ের সহিত অপর হৃদয় গ্রথিত করিয়া সংসারে স্বর্গরাজ্য বিস্তার করে।

কিন্তু এমন সুন্দর পদার্থ হইলেও পৃথিবীতে এই ভালবাসার নামে একটা অপবাদ আছে। অপবাদই বল, আর বিকৃতিই বল, ভালবাসার নামে এখানে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসায় চলিতেছে, এই ব্যবসায়ে অবাধে ভালবাসাপণে স্বার্থ বিনিময় হইতেছে। ভালবাসা এখানে বিনিময়ের মূলধন, আদান প্রদান হইতেছে

স্বার্থ। একটু হাসিয়া, একটু প্রাণ কাড়িয়া, একটু দাঁড়াইয়া মানুষ এখানে কেনা বেচা করিয়া আবার নিমেষমধ্যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার সন্ধান নাই। মোহ-ভ্রান্ত চঞ্চল মন শত বার শত দিকে ধাবিত হইতে থাকে, হিতাহিতজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্ষিপ্ত মন কোথাকার কোন্ মুক্ত সচ্ছন্দতার অন্বেষণে নিয়ত কোন্ স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার সীমা কোথায়? ভালবাসা লইয়া এ জগতে সকল লোকই ব্যস্ত, কিন্তু এ ভালবাসার ভিত্তি কোথায়? সত্যতা কোথায়? যাহার ভিত্তি নাই, যাহার সত্যতা নাই, তাহা লইয়াই কি জনসমাজ ছুটাছুটি করিতেছে? হায় ভ্রান্ত মন! জগৎ কি তবে শুধু প্রহেলিকাপূর্ণ?

তবে কি মানুষ ভিত্তিহীন ভালবাসা লইয়া জগতে ব্যবসা করিয়া বেড়ায়? এ বাজারে ভালবাসা স্বেচ্ছার একটি ক্রীড়া বিশেষ। নিমেষে আকর্ষণ, নিমেষে বিচ্ছেদ, নিমেষে আসা, নিমেষে যাওয়া, নিমেষে মিলন, নিমেষে বিসর্জ্জন। আজ তোমার ঘরে একটু সৌন্দর্য্য আছে, একটু সদ্‌গুণ আছে, একটু লোকের দাঁড়াইবার স্থান আছে। আজ তোমার ঘর জনসমাগমে পরিপূর্ণ, দলে দলে বান্ধবদল আসিয়া তোমাকে স্বর্গের উচ্চতর সোপানে তুলিতেছে, প্রশংসার স্তুতিবাদে আকাশ কম্পিত করিতেছে। কিন্তু হায়! ঐ বান্ধবদলের স্বার্থের পথে একটু বাধা দাও, দেখিবে নিমেষমধ্যে পৃথিবীর ধূলারাশির খেলা ফুরাইয়া যাইবে, আর কেহ তোমার কাছে থাকিবে না। তুমি যে একাকী, সেই একাকী। বন্ধুত্বের যে একটা কোন স্থায়ী প্রভাব আছে, দিন দিন এ কথাটীও কাল্পনিক বলিয়া মনে হইবে। বন্ধুত্বটা সংসারবাজারে কেবল একটা বিনিময়ের কৌশল হইয়া উঠিয়াছে। স্থায়িরূপে নিঃস্বার্থভাবে অতি অল্প লোকই অল্প লোককে ভালবাসে। দিন দিন ভালবাসা অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া উঠিতেছে। ইহা মানুষমাত্রেরই হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরিচয়-মাত্র। ইহা রক্ষা করিতে হইলে একটু সহিষ্ণুতা চাই, একটু দৃঢ়তা চাই। ভালবাসায় ভুক্তি মুক্তি দুইই নিহিত রহিয়াছে। যিনি চিত্তচাঞ্চল্যশূন্য সংযমী, তিনি ইহার স্বর্গীয় মধুরিমা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শত চঞ্চলতার মধ্যে থাকিয়া, শত স্বার্থের কোলাহল শুনিয়াও তিনি সেই স্থান হইতে সযত্নে তাহা সংগ্রহ করেন।

বার বার প্রতারিত হইয়াও মানুষ ইহার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করে। স্বর্গের পদার্থের প্রতি কি আকর্ষণ! সুধা ভ্রমে গরল, হিরক ভ্রমে কাচ পাইয়াও মানুষ এই পবিত্র প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। কোন কবি বলিয়াছেন, ভালবাসার জন্য যে পাগল নয়, সে মানুষ নয়, পশু। ভালবাসা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়। এই পৃথিবীতে ভালবাসার আকর্ষণে কি এক

সঞ্জিবনী শক্তি আছে। ইহাতে স্বর্গের পীযূষধারা নিয়ত অনুভব করা যায়।

এই ভালবাসার মৃদু মূর্চ্ছনা নীরব তন্ত্রীতে মধুর কোমল রাগিণী তুলিয়া মানুষকে স্বর্গের আবেশে অভিভূত করে। ইহার প্রত্যেক ঝঙ্কারে ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমা, বিচিত্র আকর্ষণ, সুন্দর বিচিত্রতা, গভীরভাবে বিশ্বপ্রাণে অঙ্কিত হইতে থাকে। ভালবাসা সুন্দর মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। মানুষের হৃদয় এখানে নিত্য মুক্ত, নিত্য উদার ও প্রফুল্ল থাকে। সংসারের সমুদায় সুখ দুঃখ তৃণের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত সাগরে বিলীন হয়। হৃদয়ে বিমল শান্তিকিরণ পূর্ণভাবে বিকীর্ণ হইতে থাকে। যাহাকে যে ভালবাসে, তাহার অদর্শন, তাহার মলিন বদন, তাহার অসুখ, সে সহিতে পারে না। সেখানে নিমগ্ন ভাব, সেখানে আত্মহীনতা নাই। সেখানে কেবল সে, সে আছে তাই আছি, সে হাসে তাই হাসি। তার মুখখানি পৃথিবীর সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম। এমন সুন্দর আর কিছুই নাই, জগতের কোন পদার্থেরই তাহার সহিত তুলনা হয় না। সেখানে জগৎ নাই, সেখানে আত্ম নাই, সেখানে কেবল সে, এক ভিন্ন দুই নাই। আমিত্বই পাপের মূল এবং তাহার বিনাশেই পুণ্যের বিকাশ। বাইবেল-বর্ণিত ঈশার সমস্ত সাধনার ফল আমিত্ব-বিনাশ। তিনি কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের বাদ্যযন্ত্র। সেই পুরুষ যাহা বাজান, তাহাই মধুর। তিনি কেবল আত্ম-ইচ্ছা নীরোধ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। এই আত্ম-বিনাশেই সমস্ত বিলয় ও পুণ্যের বিকাশ। আমি নাই, আমি জলধিতে বিলীন হইয়া গিয়াছি, এই তাঁহার সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবার কারণ। ইহাই তাঁহার পাপী ও পতিতকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান উপায়। ইহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থার ধ্বংস বা শূন্য ভাব নহে। ইহা জীবনের অবিনশ্বর ভাব, নির্ম্মল সত্তা, নিত্যতা, পূর্ণতা, জ্ঞান, শান্তি, পরিশুদ্ধি, ও নির্ব্বিকার চৈতন্য জাগাইয়া তোলে।

আমাদের আর্য্য দার্শনিকগণও ইহার সুন্দর দৃশ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গীতা প্রভৃতিতেও ইহার সুন্দর ভাব পরিষ্কার-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভালবাসা এই বিশ্বরাজ্যে বিধাতার অসীম করুণার দান। যদি এই ভালবাসার মধুর আবরণ সমস্ত প্রাণীকে আবৃত করিয়া না রাখিত, তবে জগতে কত বিশৃঙ্খলা হইত এবং মানুষ কত প্রকার অনিয়ম করিয়া সৃষ্টিধ্বংস করিতে পারিত। এই ভালবাসার পবিত্র আকর্ষণে একের হৃদয় অপরের হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারি ইচ্ছার দিকে অগ্রসর হয়। বীরের তেজোদীপ্ত দৃঢ় হৃদয়, গর্ব্বিতের গর্ব্ব, ধনীর সম্মান, দরিদ্রের আকিঞ্চন, সবই ভালবাসার দ্বারে অবনত। ইহার প্রভাবে কি সুন্দর মনোহর ঝঙ্কারে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দয়ায় সঞ্জীবিত রহিয়াছে,

তাঁহারই অসীম করুণায় মানুষ সংসারের আসক্তিময় প্রণয় হইতে তাঁহারই অনন্ত প্রেমখনির সন্ধান করিয়া লয়। ধন্য প্রেম! ধন্য ভালবাসা! ইহা দ্বারা ভুল, ভ্রান্তি, আশা, রূপতৃষ্ণা, সবই তাঁহার অনন্ত প্রেম সাগরে বিলীন হয়। বসন্তের শীতল বাতাস, প্রবাহিনীর তরঙ্গ, বর্ষার মেঘ, কোকিলের সঙ্গীত, সবই তাঁহার রূপচ্ছটায় মিশিয়া যায়। পাপ, দুঃখ ও দৈন্যতার মধ্যে থাকিয়া হৃদয় অপূর্ব্ব শান্তিরসে আপ্লুত হয়।

এই ভালবাসাই সংসারে মুক্তির সুন্দর পথ। ইহাতেই স্বর্গ, মর্ত্ত সম্মিলিত। ইহাই অসীম সসীমে মিলিত হইবার সুন্দর ও আশ্চর্য্য উপায়। ধন্য ভালবাসা! ইহার নির্ম্মল আকর্ষণে ভক্তহৃদয় মুগ্ধ, আপন-বর্জ্জিত। সংসারের সমস্ত সম্পদ্ অনিত্য, আসক্তিশূন্য মনে হয়; একীভূত আত্মা তখন বিশ্ব জগতের অভ্যন্তরে তন্ময় হইয়া ভাবে বিভোর হইয়া যায়। এই তৃষ্ণার জ্বালায় মানুষ দিবানিশি জ্বলিতেছে। এই তৃষ্ণাই মানুষের মুক্তির পথ অবরোধ করিতেছে, ইহাতেই মৃত্যু শোক ও দুঃখের আস্পদ বলিয়া মনে হয়। এই রূপতৃষ্ণা প্রদীপ্ত থাকাতেই বাসনা, তৃষ্ণা, বেদনা, সুখ, দুঃখ, স্পৃহা, রাগ, দ্বেষ, মমতা এই সব ইন্দ্রিয়বিকার উৎপন্ন হইয়া মানুষকে পৈশাচিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা করিয়া তোলে। আবার এই ভালবাসার করুণ ঝঙ্কারে আবিলতাময় হৃদয়ের প্রত্যেক কন্দরে ভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়া কর্ত্তব্যের শিথিলতাজনিত অনুতাপ আনয়ন করে। ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী তখন আপনা আপনিই বলিয়া উঠে—

"অন্তরযামী ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজার আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান।

সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি, তোমারি ভাবেতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান!"

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

মারসি মারভিল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইহা আমার দেহের পরিমাণের অনুরূপ।

লর্ড মারভিল বলিলেন—"বেশ, তবে আমি চলিলাম। একজন স্ত্রীলোককে এই-রূপে যন্ত্রণা দেওয়া আমি দেখিতে চাহি না।

অ্যালোইস্ লর্ড মারভিলের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—

"কেন ষ্টিফেন, তুমি এইরূপ অসঙ্গত কথা বলিতেছ? এই বালিকা এইরূপ কার্য্য করিয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া

থাকে। আর আমরাও এত শ্রান্ত হই নাই যে, আজ আর কেনা বেচা করিতে পারিব না।"

অ্যালোইসের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মারসি উত্তর করিল –

"হাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন।"

এই বলিয়া সে অন্য পরিচ্ছদ আনয়ন করিবার জন্য অন্য গৃহে গমন করিল। এই গৃহে গমন করিয়া তাহার মাথা অত্যন্ত ঘুরিতে লাগিল, এবং সে এতদুর অসুস্থ বোধ করিল যে, পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাহার মনে হইতে লাগিল যেন দুইটি সহানুভূতিপূর্ণ নয়ন ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সেই সহানুভূতিপূর্ণ নয়ন দুটী লর্ড মারভিলের। মারসি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে অ্যালোইস মাডাম লিসের অন্য সাহায্যকারিণীর সহায়তায় তাহার মনোনীত বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ক্রয় শেষ করিল।

মারসির যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন তাহার মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল। মারসি পূর্ব্বে কখন এরূপ অসুস্থ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে নাই। সহসা এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পাছে ম্যাডাম লিস তাহাকে কার্য্যচ্যুত করেন, এই আশঙ্কায় সে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে বলসংগ্রহ করিয়া সুস্থতার ভান দেখাইতে লাগিল এবং দিবসের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে পুনরায় নিযুক্ত হইল। ম্যাডাম লিস অল্প বেতনে তাহার ন্যায় সুন্দরী সাহায্যকারিণী প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে জানিয়া তাহার অদ্যকার এরূপ অসুস্থতার জন্য তাহাকে আর কিছু বলিলেন না। বিদায়কালে ম্যাডাম লিস তাহাকে কার্য্যচ্যুত করিলেন না দেখিয়া মারসি অত্যন্ত বিস্মিত হইল। যখন মাডাম লিসের বিপণি পরিত্যাগ করিয়া সে নিজ আবাসাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন একজন ভদ্রলোক সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া করুণাপূর্ণ স্বরে, সে কেমন আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—

"আশা করি আপনি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছেন। আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারি কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি।"

মারসি সবিস্ময়ে দেখিল যে, এই ভদ্রলোক লর্ড মারভিল স্বয়ং। তিনিই অযাচিত হইয়া তাহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মারসি ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সলজ্জবদনে উত্তর করিল—

"আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু আমি দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, আমার কোন উপকার করা আপনার একরূপ অসাধ্য।"

এই কথা বলিয়া সে তাহার গন্তব্য পথাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। লর্ড মারভিল ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। মারসির প্রতি লর্ড

মারভিলের আচরণে এরূপ ভদ্রতাসূচক করুণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল যে, মারসি তাঁহার এতদূর স্বাধীনতা গ্রহণে কোন-রূপ দোষ গ্রহণ করিতে পারিল না। বাস্তবিকই সে দিন সন্ধ্যাকালে মারসি আপনাকে জগতে এতাধিক নিঃসঙ্গ ও অসহায় বলিয়া অনুভব করিতেছিল যে, সে সময়ে যে কোন মানুষের সঙ্গ তাহার অত্যন্ত প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল। তজ্জন্য সে লর্ড মারভিলের অযাচিত সঙ্গ সহসা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। লর্ড মারভিল তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কি কার্য্যচ্যুত হইয়াছেন? আমার ভয় হইয়াছিল যে, হয়ত আপনি কার্য্যচ্যুত হইয়াছেন; আপনি সহসা এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়াতে ম্যাডাম লিস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

মারসী ইহাতে উত্তর করিল—"না, আমি কার্য্যচ্যুত হই নাই। আমি যে কার্য্য করি, তাহা অত্যন্ত ক্লান্তিকর সত্য, কিন্তু আমি জীবনে আর কখন মূর্চ্ছিত হই নাই। সেই জন্য ম্যাডাম লিস অদ্য আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।"

লর্ড মারভিল পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ম্যাডাম লিস কি আপনাকে উপযুক্ত বেতন প্রদান করিয়া থাকেন? অদ্য আপনাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া আমি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম। একজন রমণীকে খাটিয়া খাটিয়া সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দর্শন করা আমার ন্যায় একজন অলস লোকের নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।"

মারসি বলিল—"না মহাশয়, আমি যে কার্য্য করি, তাহা অধিক পরিশ্রমসাধ্য নহে। তবে কয়েক রাত্রি আমার ঘুম হয় নাই; সেই জন্য আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

লর্ড মারভিল মারসির কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ও টুপির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সম্প্রতি তাহার কোন প্রিয়-জনবিয়োগ ঘটিয়াছে। তিনি তৎপরে বলিলেন—

"তবে আপনি যথার্থই কষ্টে পড়িয়াছেন?" মারসি উত্তর করিল—"হাঁ, আমার পিতা দুই সপ্তাহ হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে জগতে আমি এক্ষণে একান্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি।"

লর্ড মারভিলের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"হায়! দুঃখিনী বালিকে!"

তাহার অসহায় অবস্থার জন্য লর্ড মারভিল তাহার প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলে মারসির নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল—

"আমার পিতার মৃত্যু আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণ ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার জন্য কার্য্য

করিতে আমার অত্যন্ত ভাল লাগিত। এক্ষণে পিতার অভাবে জীবন সুখহীন ও শান্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র নিজের জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কার্য্য করিতে আর ইচ্ছা হয় না।"

লর্ড মারভিল পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনার কি কোন বন্ধু নাই?"

মারসি বলিল—"জগতে দরিদ্রের অল্পই বন্ধুলাভ ঘটিয়া থাকে। আমার কোনও বন্ধু নাই। আমার পিতা সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত ছিলেন, সেইজন্য তিনি নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করিতে বিরত থাকিতেন।"

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর লর্ড মারভিল বলিলেন—

"তবে এক্ষণে আপনি কি করিবেন?"

মারসি বলিল—"আমি এইরূপেই কার্য্য করিব। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা আমি ভাবিতে পারি না।"

লর্ড মারভিল পূর্ব্বে কখন মারসির ন্যায় লোকের সংস্পর্শে আসেন নাই। কেহ অর্থসাহায্য চাহিলে তিনি তাহাকে তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা বশতঃ আগ্রহ সহকারে অর্থসাহায্য করিতেন। কিন্তু এ স্থলে তিনি বুঝিলেন যে, অর্থ-সাহায্যের কথা উল্লেখ করিলে মারসিকে একরূপ অপমান করা হইবে। অতএব তিনি মারসিকে পুনরায় বলিলেন—

"দেখুন, আমাকে আপনার বন্ধু হইতে দিন। আমি যে একজন চরিত্রবান্ লোক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। আমার সচ্চরিত্রের বিষয় সকল লোককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত আপনি জানেন যে, আমি শীঘ্রই বিবাহিত হইতে যাইতেছি। আসুন, কোন স্থানে উভয়ে আহার করা যাউক। আপনাকে নিঃসঙ্গ ও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার ম্লান বদন মনে হইলে আমি রাত্রিতে সুস্থিরচিত্তে নিদ্রা যাইতে পারিব না।"

মারসি বলিল—"লর্ড মারভিল, বলুন দেখি, আমার ম্লান বদন আপনাকে কিজন্য এরূপ ক্লিষ্ট করিতেছে?"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"কেন যে আপনার ম্লান বদন আমাকে এরূপ দুঃখিত করিতেছে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি সত্য কথা বলিতেছি যে, আপনার ম্লান বদন সমস্ত অপরাহ্ণকাল আমার নয়নপথে উপস্থিত ছিল।"

মারসি মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"আপনি দেখিতেছি একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"আমার অদ্য-কার আচরণ যে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে আমি এরূপ আচরণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই।"

মারসি বলিল—"আপনি আমাকে নৈশাহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে-ছেন। আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিলাম। যদি আপনি জানিতেন, আমি কিরূপ নিঃসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিদ্রা-হীন রাত্রি যাপন করি, তাহা হইলে কত দুঃখিত হইতেন! হাঁ আমি আপনার সহিত আজ রাত্রিতে আহার করিতে স্বীকৃত হইলাম। জগতে আমাকে ভালবাসিবার ও যত্ন করিবার কেহ নাই। আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমার অভিজ্ঞতায় জগতে প্রকৃত দয়া অতি বিরল। যখন আপনি আমাকে এত দয়া করিতেছেন, তখন তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারি না।"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনি কি এ কথা বলিলে আমাকে বিশ্বাস করিবেন যে, যদি আমি প্রবীণা গৃহিণী হইতাম, তাহা হইলে আমি আপনার তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিতাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মাতাও নাই, ভগিনীও নাই। নতুবা আমি আপনাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া যাইতাম। মিস স্মিথ একজন আমেরিকাবাসিনী। তিনি কিছুই বুঝিবেন না।"

এইবার মারসি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"লর্ড মারভিল! আমি আপনার সম শ্রেণীর লোক নহি এবং আমি জানি যে, আমাদের এই পরিচয় স্থায়ী হইবার নহে।"

ইহার পর তাঁহারা উভয়ে একটী শান্তিপূর্ণ সাধারণ ভোজনালয়ে নৈশাহার সমাধা করিলেন। মানুষের সঙ্গলাভে মারসির নিকট সেই সন্ধ্যাকাল দুর্লভ মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লর্ড মারভিলও একটী দয়ার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এই বিশ্বাসে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন।

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

শুভ বিবাহ।

চারি দিকে ঘন নীল পাহাড়। তাহার কোলে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়া পার্ব্বতীয় নদী বহিয়া যাইতেছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বর্ষাকাল, নব বর্ষার সমাগমে নদী পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার কূলে কূলে জল ছাপাইয়া উঠিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। নদীর ধারে নিবীড় নীল অরণ্য। উহা বর্ষার শীতল জলস্পর্শে সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল। নদীবেষ্টিত পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র গ্রামখানির নাম বিজয়পুর। নামটী যেমন জমকালো, স্থানটী তেমন নয়, অতি ক্ষুদ্র। যখন মিবারের রাণা রাজসিংহ দিল্লীয় সম্রাট আরঙ্গজেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণ প্রত্যাগমনকালে এই স্থানে এক রাত্রি বিশ্রামার্থ বাস করিয়াছিলেন।

তদবধি এই স্থানটীর নাম বিজয়পুর হইয়াছে। বিজয়পুরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। এখন গল্পটা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কমলা চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে তাহার পিতা রঘুনাথ সিংহ প্রতিবাসী রাম সিংহের পুত্র অজিতের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। কমলাও বাল্যকাল হইতে অজিতকে ভাল বাসিত। কতদিন তাহারা উভয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটী করিয়াছে, একত্রে বনের ফুল তুলিয়াছে, ফল পাড়িয়াছে, নদীতে সাঁতার দিয়াছে; নদীর ওপারে কাল পাহাড়ের মাথায় যখন চাঁদের আলো হাসিত, চারি দিকে গাছ পালায় ও নদীতরঙ্গে তাহার কনকজ্যোতি ছড়াইয়া পড়িত, দুইজনে কতদিন একত্র বসিয়া সেই শোভা দেখিয়াছে, ও মনে মনে পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছে। সে সব অনেক দিনের কথা, পুরাণ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার মাতার অনুরোধে অজিতের সহিত না হইয়া রায়গড়ের সর্দ্দার রমেশ সিংহের সহিত তাহার বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে।

অজিত সিংহ দরিদ্র, তাহার সামান্য এক খণ্ড ভূমি আছে, তাহাই চাষ করিয়া সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যখন রাণার সঙ্গে বাদসাহের যুদ্ধ হয়, তখন তরবারি-হস্তে সে যুদ্ধে গমন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে অজিত সিংহের কখনও পরাজয় হয় নাই, এজন্য রাণা তাঁহাকে ভালবাসেন ও মধ্যে মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন। এই প্রকারে তাহার দিন কাটিয়া যায়।

আর রমেশ সিংহ একটী বৃহৎ তালুকের অধিপতি। তাঁহার অধীনে দুইটী দুর্গ আছে। তাঁহার অনেক ধন সম্পত্তি ও প্রভূত সম্মান। হীরা, মণি, মাণিক, মোহর ও জহরতে তাঁহার ধনাগার পরিপূর্ণ। অতএব তাঁহার সহিত পরিণয় হইলে কমলা সাক্ষাৎ কমলাই হইবে। তাই তাহার মাতার নিতান্ত ইচ্ছা বিবাহ রমেশের সঙ্গেই হয়। রমেশেরও কমলাকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কারণ কমলা রূপে ও গুণে ঠিক কমলাই ছিল। বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন সকলে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিয়া দিন গণিতেছেন। রঘুনাথ সিংহ স্ত্রীর বড় বাধ্য ছিলেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি পত্নীর মতেই সম্মতি দিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনে মনে বুঝিলেন, এ বিবাহে কমলা সুখী হইবে না, সে অজিতকেই ভালবাসে। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? স্ত্রীর অমতে কার্য্য করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

আষাঢ়ের শেষ হইয়াছে। বর্ষা যখন ঘনরোলে নামিয়াছে, নিবিড় অরণ্যানী যখন আরো গহন হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে এক অন্ধকারময় সন্ধ্যাকালে রঘুনাথ সিংহের দাসী একখানি ক্ষুদ্র লিপি আনিয়া কমলাকে দিল। লিপি খানি অজিত সিংহ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল

"কমলা, আজ সন্ধ্যাকালে নদীতটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে কি ?"

তখন বনের মধ্যে অন্ধকার হইয়াছিল, আকাশে দুইচারিটি তারা ফুটিয়াছিল। সে দিন আকাশে মেঘ ছিল না, পাহাড়ের মাথার উপর নীল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। কমলা নদীকূলে যাইয়া বসিল। তাহার সম্মুখে নদী কল কল, ছল ছল শব্দে বহিতেছিল। সেদিনকার প্রকৃতির ছবি দেখিয়া তাহার মনে বাল্যকালের স্মৃতিগুলি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বে অজিত কমলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, কহিলেন "তোমার বিবাহের বিলম্ব নাই, বিবাহান্তে তুমি স্বামিগৃহে যাইবে, আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাই আমি আজ শেষ দেখা করিতে আসিয়াছি।" কমলা ধীরে ধীরে তাঁহার হাতখানি টানিয়া লইয়া কহিল "কে বলিল, আর দেখা হইবে না ?" অজিত সিংহ হাসিয়া কহিলেন, "তখন তুমি অপরের হইবে, আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।" কমলা কহিল "কে বলিল সম্বন্ধ থাকিবে না, তোমার আমার সম্বন্ধ কখন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।" এই কথা শুনিয়া অজিত আবার হাসিয়া কহিলেন—"তুমি নির্ব্বোধের মত কি বলিতেছ ?" কমলা অস্ফুটস্বরে কহিল, "আমার বিবাহ তুমি ছাড়া আর কাহারও সহিত হইতে পারে না।" অজিত সিংহ কহিলেন "এদিকে ত সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর মোটে পনর দিন আছে, ইহার মধ্যে কি তোমার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে ? আর আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হওয়াই উত্তম হইয়াছে। রায়গড়ে তুমি রাণী হইয়া থাকিবে, এ লক্ষ্মী রাজপুরেই শোভা পায়, আমার মত দরিদ্রের কুটীরে মানাইবে না।" কমলা নির্নিমেষনেত্রে অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে জড়িতকণ্ঠে কহিল "তোমারও মুখে ঐ কথা।" তখন অপ্রস্তুত হইয়া অজিত তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল "আমায় ক্ষমা কর, আমি অন্যায় কথা বলিয়াছি।" তার পর তাহাদের কত কথা হইল। অনেক ক্ষণ পরে উভয়ে বাটী ফিরিয়া আসিল।

রাণা জয়সিংহের সহিত মোগলের সন্ধি হইয়াছিল, কিন্তু সে সন্ধি অধিক দিন রহিল না, অচিরকালমধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে সেই সংবাদ আসিলে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রঘুনাথ সিংহের দুই পুত্র অজয় ও বিজয় ভগিনীর উপস্থিত বিবাহ উৎসব উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উৎকণ্ঠিত, সকলেই উৎসাহিত, যেন একটা নব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

অজিত সিংহও নিজের ঢাল ও তরবারি প্রস্তুত করিলেন। এরূপ ঘটনার জন্য তাঁহার মন উৎসুক হইয়াছিল, হঠাৎ তাহার বাসনা পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ রামসিংহ সজলনেত্রে মর্ম্মাহত পুত্রকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া বিদায় দিলেন। অজিত উদয়পুরে চলিয়া গেল।

ভাদ্র মাস শেষ হইয়া গেল, তখন একদিন বিজয়পুরের ক্ষুদ্র বনপথ অশ্বের পদশব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, রাজপুতেরা সব বাড়ী ফিরিতেছে। রায়গড়ের দূত আসিয়া রঘুনাথ সিংহকে কহিল "সর্দ্দার রমেশ সিংহ অক্ষতদেহে ফিরিতেছেন, তিন দিবসের মধ্যেই আসিয়া পৌছিবেন। এই পথ দিয়াই ফিরিবেন, তাঁহার ইচ্ছা একেবারে নব বধূ সঙ্গে লইয়া রাজপুরে প্রবেশ করেন।"

রঘুনাথের বাড়ীতে ধুমধাম পড়িয়া গেল। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। দুয়ারে নহবত বাজিতে লাগিল। রাজপুতললনাগণ মঙ্গলগাথা গান করিতে লাগিলেন। হাসি, বাঁশী, ফুলের মালা, গান ও নাচে বাড়ী গম্ গম্ করিতে লাগিল।

আজ রাত্রিতে বর আসিবেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সমাগত হইল, আকাশে অল্প মেঘ হইয়াছিল। সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি, কিন্তু জ্যোৎস্না ভাল করিয়া ফুটে নাই, চাঁদ কখনও হাসিতেছিল, কখনও লুকাইতেছিল। রঘুনাথের দ্বারে নহবত বাজিতে লাগিল, বাঁশি তখন মেঘরাগ ভাঁজিতেছিল।

দুয়ারে তাঞ্জাম নামিল, বর আসিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন-বেষ্টিত রঘুনাথ রাজ জামাতাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বর সভাস্থ হইলে বাঁশি উচ্চৈঃস্বরে ইমন রাগিণী গাহিতে লাগিল।

দূর হইতে একটা অস্ফুট রোদনধ্বনি শারদ রাত্রির শান্ত বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, বাঁশির সঙ্গীত-তরঙ্গ ভেদ করিয়া তাহা রঘুনাথের অন্তঃপুরে আসিয়া কমলার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল। সে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ রোদনধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে?" কয়েক দিন হইতে সমরবিজয়ী বীরগণ বাড়ী ফিরিতেছিলেন। যাহারা আর ফিরিল না, তাহাদের আত্মীয়বর্গ কয়েকদিন হইতে কাঁদিতেছে। এ শব্দ নিকটবর্ত্তী কোন্ প্রতিবাসীর গৃহ হইতে আসিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সে উৎকণ্ঠিতা হইল। মাতা গোলমালে ব্যস্ত থাকায় তাহার কথার উত্তর দিলেন না। কমলা দাসীকে সম্বাদ আনিতে পাঠাইল, দাসী কমলাকে ভালবাসিত, সে সম্বাদ আনিতে গেল।

বিবাহের সময় সভা হইতে বর আনা হইল। পুরোহিত যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কন্যা আনিতে লোক গেল, কিন্তু একি? অন্তঃপুরে কন্যা নাই, কমলা কোথায় গেল? চারি দিকে মহা গোলযোগ, একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, চারি দিকে খোঁজ খোঁজ শব্দ ও কোলাহল, বর বসিয়া রহিলেন। চেলির কাপড় পরা আগাগোড়া গহনা মোড়া কন্যাকে কে চুরি করিল? বড় গোলমাল হইতে লাগিল। কন্যার মা স্বামীর প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। একি ব্যাপার! হইল কি! রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। চারি দিকে লোকজন ছুটিল।

সর্দ্দার রমেশ সিংহ ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন "একি? আমাকে কি অপমান করিবার জন্য আনা হইয়াছে?"

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। বিবাহের লগ্ন বহিয়া যায়, তখনও কন্যার উদ্দেশ হইল না। বাঁশি গাহিয়া গাহিয়া চুপ করিল। বাদ্যকরেরা নিজের নিজের পাগড়ীগুলি উপাধান করিয়া শুইয়া পড়িল। কেবল মশালের আলোগুলি শ্মশানের আলোর মত জ্বলিতে লাগিল। বর তখনও আশা-পথ চাহিয়া সেই নির্জ্জন বিবাহমণ্ডপে বসিয়া রহিলেন।

ভাদ্রের ভরা নদী কুল কুল করিয়া বহিতেছিল, তাহার ঘোলা জলে অস্ফুট চন্দ্রালোক পড়িয়া অল্প অল্প ঝিকমিক করিতেছিল; কিয়দ্দূরে নিবিড় বন নদীর কূলে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব-সংসারের ভাব গতিক দেখিতেছিল। সেই নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার তীব্র লাল আলো চারি দিকে জ্বল জ্বল করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

নিকটে ধূলিশয্যায় ভস্মরাশির মধ্যে একজন বৃদ্ধ লুটাইতেছিল। যুদ্ধে অজিত হত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তিম-ইচ্ছা-নুযায়ী শবদেহ জন্মভূমিতে আনীত হইয়াছিল।

সর্ব্বভুক্ অগ্নি অজিতের দেহ ভস্ম করিতেছিল। সেই স্তিমিত আলোকে চারিজন শবদাহকারী বিস্মিতনেত্রে দেখিল, রক্তবর্ণ চেলির কাপড় পরা প্রতিমার মত একটী সুন্দরী বালিকা চিতানলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বাতাসে ও নদীর জলস্রোতের কল কল শব্দে যেন একটা কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"তোমার আমার সম্বন্ধ কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।" রঘুনাথের বাড়ীতে তখন বাঁশি থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ষার নদী পূর্ব্বের মত কল কল, ছল ছল শব্দে বহিতে লাগিল।

শ্রীসুকুমারী দেবী,
এলাহাবাদ, কর্ণেলগঞ্জ।

তুমি।

তুমি গগনে রয়েছ আঁকা সুনীল বসন পরি,
তুমি চাঁদেতে রয়েছ মাখা জ্যোছনার রূপ ধরি।
তুমি তপনে রয়েছ দীপ্ত উজল মহিমা মাখি,
তুমি ফুটেছ তারার হারে হীরা সম ঝকমকি।
তুমি সলিলে রয়েছ সব জীবের জীবন হয়ে,
তুমি কুসুমে সুবাসরূপে ধরণী রেখেছ ছেয়ে।
তুমি সুনীল জলধিবক্ষে প্রশান্ত গভীর প্রাণ,
তুমি মহা মহিধর পরে শোভিতেছ হে মহান্।

তুমি রয়েছ হৃদয় জুড়ে, স্নেহ প্রেম রূপ ধরে,
তুমি মরুমাঝে ওয়েসিস করুণায় পড় ঝরে।
তুমি জীবনে ফিরিছ কাছে অনন্ত সুহৃদ হয়ে,
তুমি মরমে জাগিছ চির শান্তির বারতা লয়ে।

শ্রীসুকুমারী দেবী,
এলাহাবাদ, কর্ণেলগঞ্জ।

সুমতির শিক্ষা।

তুই কি উঠ্‌বি না, স্নান কর্‌বি না, খাবিও না, বসিয়া বসিয়া কেবল গল্পই কর্‌বি ?

"যাই মা!"

"যাই মা, যাই মা ত কর্‌ছিস্ দুই ঘণ্টা ধরিয়া শুন্‌তে পাচ্ছি, এই কথা বলিয়া একজন রমণী রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে খাওয়াইয়া ধুয়াইয়া ঘুম পাড়াইলেন। তখন বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি দুধ জ্বাল দিতে দিতে ডাকিলেন "সুমতি, ও সুমতি! আজ কি আর তোদের গল্পের শেষ হবে না ?"

"যাই মা।"

সুমতির মা দুধ জ্বাল দিয়া বাটী বাটী ঢালিয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া কন্যার নিকট গেলেন; কহিলেন, "হ্যাঁ লো, তোদের কি হ'য়েছে? যা বাছা সুজা, ঘরে যা; নেয়ে ধুয়ে খাগে, গল্প করিতে বসিলে তোদের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, তোরা যেন বাছা আদা নুন খেয়ে গল্প করিতে বসেছিস্।"

সুমতির সখি সুজা চলিয়া যায় দেখিয়া সুমতি কহিল, ভাই! নেয়ে খেয়ে আবার আসিস্, দেখিস যেন দেরী করিস্ নে।"

"আচ্ছা আস্‌বো" বলিয়া সুজা চলিয়া গেল। সুমতিও চুলের খোঁপা খুলিয়া নাইতে গেল।

সুমতির মা এই অবসরে রান্নাঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন এবং চাকর চাকরাণীকে খাওয়াইয়া সুমতির জন্য ভাত লইয়া ডাকিলেন, "সুমতি ও সুমতি, বলি আজ কি নাইতেই থাকবি—না আসবি, তুই নাইতে নাইতে আমি কত কাজ করিয়া ফেলিলাম দেখ দেখি!"

সুমতি স্নান করিয়া খাইতে আসিল।

সুমতির মাতা কার্পেটের উপর ফুল বুনিতেছিলেন। যখন ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল, তখন তিনি বুনন কার্য্য স্থগিত রাখিয়া উঠিলেন, কাপড় চোপড় সব তুলিলেন এবং বিছানা করিয়া পান সাজিলেন। তখনও সুমতির দেখা নাই, সুমতি বাড়ীর বাগানের

ভিতর একটী ফুলগাছের নীচে বসিয়া সুজার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। মা ডাকিলেন "হাঁলো! চুল বাঁধবি নাকি লো, বাঁধবি তো আয়, আমি কুটনা কুটতে যাব।"

সুমতি উঠিয়া গেল। যাওয়ার সময় সুজাকে বলিয়া গেল "চুল টুল বেঁধে আবার আসিস ভাই।"

সুমতির চুল বাঁধা হয়ে গেলে মা তাহাকে আলতা পরাইয়া দিলেন। সুমতি তখন মায়ের সেলাইটি হাতে তুলিয়া লইল ও নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, "তুমি এগুলি কি করে সেলাই কর মা?"

মা কহিলেন "যেমন করিয়া লোকে করে"—

"কি করে শেখা যায়?"

মা—"শিখ্‌লেই শেখা যায়।"

"না, এ আমার কাজ নয়" বলিয়া সুমতি চলিয়া গেল।

সুজা আসিয়া পথে তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। তখন নভোপটে নবজলদের আয়োজন হইতেছিল, কিন্তু তাহাদের সে দিকে একটুও দৃষ্টি ছিল না। তাহারা মাঠের উপর দিয়া, ঘাটের কাছ দিয়া, শ্যামের মার বাড়ী বামে রাখিয়া, রামের মার বাড়ী দক্ষিণে ফেলিয়া, ফুলের বাগান পিছনে রাখিয়া, কেবল সম্মুখে আমের বাগানের দিকেই ছুটিতে লাগিল। তখন বৈশাখের প্রারম্ভ, আমের বাগানে গেলে আম খাইতে পাইবে কিনা, তাই তাহারা আমের বাগানের দিকে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আর যাওয়া হইল না। ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া তাহারা সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না, বিশেষতঃ সুমতির। কুটীরের মধ্যে একটী অন্ধ বালিকা উপবিষ্ট হইয়া একমনে মোজা বুনিতে বুনিতে মধুর গান গাহিতেছিল। তাহাদের শব্দ পাইয়া সে সঙ্গীত বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে গা?"

সুমতি আপনাদের পরিচয় দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জন্মান্ধ?"

বালিকা কহিল "হাঁ।"

সুমতি কহিল, "তবে তুমি কিরূপে মোজা বুনিতে শিখিলে? তুমি ত আর দেবতা নও।"

অন্ধ বালিকা কহিল "আমার একজন আত্মীয়া রমণী আমাকে মোজা বুনিতে শিখাইয়াছেন"।

সুমতি—"তুমি কিরূপে শিখিলে তাহা বল।"

অন্ধ বালিকা কহিল "বুনা শিখিতে আমার খুব কষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে আমি এত ধীরে ধীরে কাজ করিয়াছিলাম যে, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদ্বারা বুঝি এ কাজ হইবে না। কিন্তু "সাধু যার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তার সহায়,"—শুধু করিতে করিতেই বুনিতে শিখিলাম।

এখন ইহাতে আর আমার কোন কষ্ট নাই। এখন আমি কত মোজা, কত দস্তানা প্রতিদিন বুনি এবং তাহাদ্বারা দুঃখিনী মাতার কত সাহায্য হয়"।

অন্ধ বালিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমতির মনে শিক্ষার পিপাসা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। সে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া মাতার নিকট সমস্ত বিষয় বিবৃত করিল।

সুমতির মাতা সুমতির মুখে এই প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। সেই দিন হইতে সুমতির উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সে আর গল্পও করে না, বেশী খেলাও খেলে না, অল্পক্ষণমাত্র বিশ্রাম করে। সকাল বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত নিজের কাজ করে। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।" কিছুকালের মধ্যেই অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে সুমতি একটী রত্ন হইয়া উঠিল। তখন সে বুঝিল যে, অধ্যবসায় দ্বারা না হয় এমন কাজ পৃথিবীতে অতি বিরল। এইজন্যই জ্ঞানীরা বলেন, "অধ্যবসায় সৌভাগ্যের প্রসূতি।"

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

বাল্য-বিবাহ।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আর কি নূতন কথা বলিব? বলিবার কিছুই নাই। শত শত লোক শত শত বার ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তবে বোধ হয় এস্থলে অবাধে বলিতে সাধারণের অনুমতি পাইব যে, এই ভীষণ সামাজিক রোগ যেমন তেমনই আছে, উহার কিছুই উপশম দেখা যায় না। যেন সে রোগের বিচক্ষণ ভিষক্‌ও নাই, উপযুক্ত ভেষজও নাই। "হাতুড়ের" চিকিৎসায় কুইনাইনপ্রয়োগে জ্বর এক ডিগ্রি কমে, কিন্তু পরে আবার তাহা দুই ডিগ্রি বাড়ে। সরল ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দায়ে পড়িয়া ভদ্রলোকগণ তাঁহাদিগের মধ্যে ইহা একটু কমাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সুবিধা হইলে বর কন্যা উভয়পক্ষীয় কেহই টাকা লইতে ছাড়েন না। টাকা এমন জিনিষ যে, ইহার নিকট বিদ্যা বুদ্ধি সকলই মস্তক অবনত করে।

এখন কথা হইতেছে যে, কন্যার এবং পাত্রের কত বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে আমরা উক্ত বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলিব। শাস্ত্রে আছে, পাত্রের বয়ঃক্রম পাত্রীর বয়ঃক্রমের তিনগুণ হওয়া চাই। যেমন, পাত্রীর বয়স যদি ১২ বৎসর হয়, পাত্রের বয়স তাহা হইলে ৩৬ বৎসর হওয়া উচিত। কিন্তু এই অনুশাসনে স্পষ্ট

দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে উভয়ের পার্থক্য কিছু অধিক থাকে। আমার বিবেচনায় ৮।১০ বৎসরের প্রভেদ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। সভ্য পাশ্চাত্য জগতে পাত্রের বয়স কন্যার বয়স অপেক্ষা অনেক কম হইলেও বিবাহ হয় এবং ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ ও অন্যান্য স্থানেও এবম্বিধ বিবাহ অনুমোদিত হয় বটে, তথাপি আমি এরূপ বিবাহ সমর্থন করিতে পারি না। এরূপ পরিণয়ের অনেক দোষ। পাত্রের বয়স অত্যন্ত অধিক হইলেও এইরূপ অনেক দোষ লক্ষিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে মধ্যভারত হইতে পণ্ডিতা গায়ত্রী দেবী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইঁহার মুখে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। সুতরাং ইহা শুনিবার জন্য দুই একজন বন্ধুর সহিত ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে গিয়াছিলাম। বক্তৃতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা আমার বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। স্ত্রীলোকের মুখে বাল্যবিবাহের অপকারিতার কথা শ্রবণ করিবার জন্য আমার কৌতূহল উত্তেজিত হইয়াছিল। ইঁহার বক্তৃতার এই মর্ম্ম গ্রহণ করিলাম যে, সম্পূর্ণরূপে একজনের জীবনের সুখ দুঃখ-ভার বহন করিবার জ্ঞান বাল্যে কখনই হইতে পারে না, অধিক বয়সের প্রয়োজন। গায়ত্রী দেবী একবারেই গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থিনী হইলেন যে, সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যেমন নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথা নিবারণার্থ আইন প্রণয়ন করিয়া ইহা বন্ধ করিয়াছেন, আইন করিয়া বাল্যবিবাহও সেইরূপে বন্ধ করুন। কিন্তু তাহা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের দেশে ও মহারাষ্ট্র দেশে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতে পারি যে, এই বঙ্গদেশের জন্য প্রার্থিত আইনের আদৌ প্রয়োজন নাই। এ দেশে যে কোন কারণেই হউক, ইহা ভদ্রসমাজে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। নীচজাতীয় লোকদিগের মধ্যে এখনও যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

সময়।

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে সময় স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত চলিতেছে। এই বিশাল সৃষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া সময় সরীসৃপের ন্যায় মানবের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে ও আবার তেমনি বেশে, তেমনি সাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সময় পূর্ব্বের বেশেই ফিরিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু মানবমাত্রেরই এই নব দিনের আগমনে অতীতের আলোচনায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রেয়ঃসাধনে যত্নশীল হওয়া

আবশ্যক। যিনি গত কল্যের কার্য্য এবং তাহার ফলাফল বা লাভালাভ বিষয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান জীবনকে অপেক্ষাকৃত উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, তিনি অনেক লাভ করিতে পারেন। গত কল্য আলস্য দোষে ও বুদ্ধির দোষে যাহা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, অদ্য তাহা সংশোধনের জন্য যিনি সচেষ্ট, তাঁহার ভাগ্যে সুখ অবশ্যম্ভাবী। গত কল্য আমি বুদ্ধির দোষে ও আলস্য-দোষে অনেক ক্ষতি করিয়া ফেলিয়াছি ভাবিয়া যিনি নিরাশ হন, তাঁহারই দুঃখ অনিবার্য্য। ক্ষতিপূরণের জন্য যিনি প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ করেন, সিদ্ধিলাভ তাঁহারই নিকটবর্ত্তী।

"কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ!"

সময় পলে পলে মানবের পরমায়ু শোষণ করিয়া স্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে। সময়ের গতি অবরোধ করা অসাধ্য। এ নিমিত্ত সময়কে কোন ক্রমেই বিফলে যাইতে দেওয়া বিধেয় নহে।

কিন্তু মানবের সমুদায় উন্নতির আদর্শই ভাবনাশুদ্ধি। মন শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত না হইলে, হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি না হইলে, মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যে মানবের সিদ্ধিলাভ না ঘটে, তাঁহার শান্তি কোথায়? এই জগতে একমাত্র সাধু পুণ্যাত্মাগণই শ্রেয়ঃপথের প্রবর্ত্তক এবং শান্তি ও প্রেমরাজ্যের নেতা। যাঁহার উপদেশে ও সহবাসে জড় জীবন চৈতন্য লাভ করে, তিনিই সাধু।

যিনি ভাল বুঝিতে পারেন না, কপটীকে অকপটী বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি অমৃতভ্রমে বিষপান, চন্দনভ্রমে বিষবৃক্ষকে আলিঙ্গন ও মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকেন। কপটী হইতে আপনাকে দূরে রাখা ও সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বক্ষণ আত্মরক্ষণে যত্নশীল হওয়া সকলের উচিত। সময়ের পরিসীমা নাই। যাহার ঐকান্তিকতা আছে, তিনি পুনঃ পুনঃ সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য্য হইয়াও অবশেষে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

বিপদের সময় ধৈর্য্য সহকারে চলিলে অবসন্নতা ও নৈরাশ্য আসিতে পারে না। গত কল্য দুঃখে কাটিয়াছে বলিয়া কি অদ্যকার সুখের পথের রন্ধ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল?

অসীমশক্তিমান্ ও শান্তি-প্রদাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলে কি বিপদ থাকে? তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিলে এবং সর্ব্বভূতে সেই একমাত্র সত্যস্বরূপের সত্তা অনুভব করিতে পারিলে বিপদ কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহার নাম লইয়াই তাঁহার প্রদত্ত জীবনের উন্নতির জন্যই, তাঁহার সৃষ্টির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্যই, তাঁহার মানবসন্তানগণের সময় যাহাতে কোনক্রমে বৃথা নষ্ট না হয় ও অতীতের ক্ষতি স্মরণ করিয়া মন যাহাতে বিক্ষুব্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

সতীপঞ্চক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একপত্নী।

একপত্নী সামান্য গৃহস্থের পত্নী, কিন্তু মহাজ্ঞানবতী। ইনি একমাত্র পতিসেবাই সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়া সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকেও পরাস্ত করিয়াছেন।

একদা এক কৌশিক ব্রাহ্মণ বহুকাল তপস্যা করিয়া লোকালয়ে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার উপরে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। ব্রাহ্মণের ক্রোধদৃষ্টিতে তখনই বক ভস্মীভূত হইলে তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত হন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি অপরিমিত ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি একপত্নীর বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। গৃহস্বামিনী সাধ্বী একপত্নী তাঁহাকে কহিলেন, "মহর্ষে! অবস্থান করুন।" এই কথা বলিয়া ভিক্ষার পাত্র ধৌত করিয়া ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার ভর্ত্তা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে আগমন করেন। তখন সেই পতিব্রতা একপত্নী পতিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভর্ত্তাকে আসন, আচমনীয় ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করতঃ বিনম্র ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সেই ভর্ত্তৃচিত্তানুসারিণী ভামিনী একপত্নী প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেন, তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মানিতেন, তাঁহার কায় মন বা বাক্য কখনও অন্য চিন্তায় রত হইত না। তাঁহার চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ পতির প্রতিই উপগত হইত, সুতরাং তিনি পতিশুশ্রূষাতেই নিরতা থাকিতেন। সদাচার, শুচি ও কর্ম্মকুশলা হইয়া তিনি যাহাতে ভর্ত্তার মঙ্গল হয়, সতত তাহাই করিতেন। কেবল তাহাই নহে, আত্মীয় কুটুম্বেরও হিতসাধন করিতেন, এবং সতত ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন। সেই শুভাননা যশস্বিনী সাধ্বী একপত্নী তৎকালে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-কামনায় অবস্থিত দেখিয়াও পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষণে শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার কথা মনে হইলে অতিশয় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপ্রের জন্য ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিপ্র রোষভরে কহিলেন, "হে ভামিনি! তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি আমাকে 'অবস্থান করুন' বলিয়া উপরোধ করিলে, কিন্তু বিদায় করিলে না। তোমার ব্রাহ্মণে এত অশ্রদ্ধা?" সাধ্বী একপত্নী ব্রাহ্মণকে ক্রোধে ও তেজে উদ্দীপ্ত দেখিয়া, অতি

বিনম্রভাবে মধুর বচনে কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন, ভর্ত্তা আমার পরম দেবতা, তিনিও আপনার মত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া সমাগত হওয়াতে আমি তাঁহারই শুশ্রূষা করিতেছিলাম। আমার দোষ কি? তিনিই আমার পরমারাধ্য ইষ্টদেবতা।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মূর্খে! তোমার নিকটে ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ অতিথি গরীয়ান্ না হইয়া পতিই গুরুতর হইলেন? তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা কর? মর্ত্তালোকে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিয়া থাকেন। রে দাম্ভিকে! তুমি কি জান না, অথবা বৃদ্ধদিগের নিকটে কি কখন শুন নাই যে, ব্রাহ্মণ অগ্নি সদৃশ, ক্রুদ্ধ হইলে সাগরাম্বরা ধরাকেও দগ্ধ করিতে পারেন?"

একপত্নী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে বিপ্রেন্দ্র! আমি 'বক' নহি; আমি আপনার মত ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্মণের শাপকে ভয় করি না। অতএব হে তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া কোপদৃষ্টিতে আমার কিছুই করিতে পারিবেন না। হে বিপ্র! আমি দেবতুল্য মনস্বী ও তপস্বী বিপ্রকে কখনও অবজ্ঞা করি না, অতএব হে অনঘ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিপ্রগণের মহাজ্ঞান ও তেজ আমার বেশ জানা আছে, তাঁহারা কোপে সাগরকে অপেয়-লবণোদক করিয়াছেন। বিশুদ্ধাত্মা দীপ্ততেজা মুনিগণের তপঃপ্রভাব ও মাহাত্ম্য আমি জানি, তাঁহাদিগের ক্রোধ অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপশান্ত হয় নাই। দুরাত্মা মহাসুর বাতাপি ব্রাহ্মণগণের পরিভব হেতু অগস্ত্যের উদরস্থ হইয়াছে। ফলতঃ মহাত্মা ব্রাহ্মণের ক্রোধ ও প্রসন্নতা উভয়ই অতি বিপুল। ব্রাহ্মণের বহুতর প্রভাব আমি শুনিয়াছি। হে নিষ্পাপ! এই ব্যতিক্রম জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! পতিশুশ্রূষায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, সেই অতুলনীয় ধর্ম্মেই আমার রুচি। হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত দেবতার মধ্যে ভর্ত্তাই আমার পরমদেবতা। অতএব আমি পরমদেবতানির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবা করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! পতিশুশ্রূষায় যাদৃশ ফল, তাহা সন্দর্শন করুন। আপনার ক্রোধানলে বলাকা যে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি। সে বক নয়, আপনার উপার্জ্জিত ধর্ম্মকে আপনি ক্রোধাবেগে নষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! ক্রোধ মানুষের মহাশত্রু। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসার মধ্যে যিনি সত্য কথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি এবং কামক্রোধাদি রিপুগণ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া

জানেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে মনস্বী পুরুষ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে লোকমাত্রকেই আত্মসদৃশ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে দ্বিজপুঙ্গব! যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া বেদ অধ্যয়ন করেন, এবং স্বাধ্যায়ে অপ্রমত্ত থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। এতাদৃশ সত্যসম্ভাষী ব্রাহ্মণের মন কখনও অসত্যে রত হয় না। হে দ্বিজসত্তম! স্বাধ্যায়, দম, সারল্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ মানবেরা সত্য ও সারল্যকে পরম ধর্ম্ম কহেন। দুর্জ্ঞেয় শাশ্বত ধর্ম্ম একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতদিগের অনুশাসন এই যে, শ্রুতিই ধর্ম্মের পরিমাপক, সেই শ্রুতিধর্ম্ম বহু প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা অতি সূক্ষ্ম। "হে ভগবন্! আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত ও শুচি বটেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। হে বিপ্র! যদি আপনি পরম ধর্ম্ম না জানেন, তবে মিথিলাদেশে যাইয়া ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ মাতা পিতার শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সেই ব্যক্তি আপনাকে সত্য ধর্ম্ম কি তাহা কহিবে। আপনার মঙ্গল হউক, ইচ্ছা হয় ত আপনি তথায় গমন করুন। হে অনিন্দিত! আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম, তাহা অযুক্ত হইলেও অবলা জ্ঞানে ক্ষমা করা আপনার উচিত, কারণ, যাঁহারা ধর্ম্মলাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের নিকট স্ত্রীজাতি অবধ্য।"

ধর্ম্ম-বল গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ সতী একপত্নীর সারগর্ভ সত্য বাক্য, বিশেষতঃ তাঁহার নির্জ্জনে বকবিনাশের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "হে শোভনে! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার পতিভক্তি দর্শনে এবং সাধুবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এবং আমার ক্রোধও অপগত হইয়াছে। তুমি তিরস্কারছলে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা আমার কেন, সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। হে শোভনে! আমি ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট গমন করিতেছি, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি পতিসেবায় রত হও।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন। একপত্নী ও পতিসেবাধর্ম্মের প্রভাবে সুরলোকে গমন করিলেন।

শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী।

স্বর্গীয়া প্রিয়বালা।

গত ১৩১৭ সালের ৩রা ফাল্গুন পিরোজপুর গ্রামে আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা সহোদরা প্রিয়বালা পরলোক গমন করে। তাহার স্বামী ডাক্তার শ্রীমান্ যামিনীকান্ত সেন, এল, এম, এস, কার্য্যোপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। প্রিয়বালার মৃতাবস্থার একখানি ও শ্মশানের একখানি ফটো রাখা হইয়াছে। মৃত অবস্থার ফটোখানি এইরূপ—মাতা পিতা পার্শ্বে সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহাদের গাত্রে প্রিয়বালার হাত রহিয়াছে, মস্তকদেশ স্বামিবক্ষে স্থাপিত। প্রিয়বালার নিমীলিত চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধস্ফুট হইয়া ঊর্দ্ধদিকে অনন্তের পানে নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; যেন সে চিরযোগে নিমগ্না রহিয়াছে। শ্মশানের ফটোখানি অন্যরূপ—তাহাতে পবিত্র প্রশান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে। তখন প্রিয়বালার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব পবিত্র জ্যোতিতে সমালঙ্কৃত হইয়া সংসারের অনিত্যতার পরিচয় দিতেছে।

হায় ভগিনি! তুমি আর এ সংসারে নাই, এ কথা কি প্রকারে মনে ভাবি? প্রাণ যে বিদীর্ণ হইতে চায়। তুমি যে আমাদের সকলের বড় ভালবাসার পাত্রী। তুমি সর্ব্বকনিষ্ঠা, তোমার প্রতি মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী সকলেরই অধিক স্নেহ। পরিবারের মধ্যে সকলের উপরে তোমার আবদার ছিল। আমরা ভাই, ভগ্নীতে সাতটি (৩ ভাই ও ৪ ভগ্নী)। যখন আমরা বেশ একটু বড় হইয়াছিলাম, স্কুলে পড়িতাম, একসঙ্গে গান করিতাম, উপাসনা করিতাম, তখন পরিবারটী কত সুখের ছিল। আমাদের স্নেহময়ী জননী দিবারাত্রি খাটিতেন, কিন্তু মেয়েদের সুশিক্ষার প্রতি কখনও উদাসীন ছিলেন না। তিনি আমাদিগকে সযত্নে গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, সূচীকার্য্য প্রভৃতি শিখাইতেন এবং নিজ আচরণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিতেন। আর আমাদের পরম স্নেহময় জনক স্কুলের বাঙ্গালা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজে আমাদিগকে গৃহে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। তাঁহাকে অফিসের কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। তথাপি প্রত্যহ প্রাতে তিনি আমাদিগকে ইংরাজী পাঠ অভ্যাস করাইতেন এবং সন্ধ্যার পরে আফিস হইতে আসিয়া, সেই পাঠ আবার জিজ্ঞাসা করিতেন। তৎপরে সঙ্গীত ও বাদ্য শিখাইতেন। তখন আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নীর সম্মিলন কি মধুর ছিল। অনেকে বলিয়াছেন, মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী প্রত্যেক ঘরেই আছে কিন্তু এমন সম্মিলন অতি বিরল, এ যেন ঠিক প্রেমপরিবার। তখন আমাদের দেবোপম জনক ও জননীর হৃদয় কি প্রকার আনন্দময় ও সুখময় ছিল। আমরাও

নিরুপম সুখশান্তিতে জীবনের সেই মধুময় দিনগুলি কাটাইয়াছি। হায় রে! জীবনে সে সুখের দিন আর ফিরিবে না!

আমাদের স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহশীল পিতা বিদ্যা ও সাংসারিক কার্য্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যশীল জীবন লাভ করিতে পারি ও সুখ সচ্ছন্দতা সহকারে জীবন কাটাইতে পারি, তজ্জন্য ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন।

আমাদের পিতা মাতা আমাদিগকে শুধু সুশিক্ষা দিতে যত্নবান্ থাকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সর্ব্ব প্রযত্নে, অর্থের দিকে না চাহিয়া, সৎপাত্রের অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রত্যেক কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পিতার এই সামান্য আয়ে তিনি চতুর্দ্দিকের সমস্ত খরচ বজায় রাখিয়া, জামাতাদিগের প্রত্যেকর কলেজে পড়ার ব্যয়ভার বহন করিয়া, প্রত্যেককে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছেন।*

হিরণের† স্বামীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার খরচ ৫।৬ বৎসর বহন করিয়াছিলেন। তাহার স্বামী শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন সেন যখন কলেজ হইতে বাহির হইয়া কর্ম্ম পাইলেন, সেই সুখের সময় স্নেহের প্রতিমা হিরণ পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে নিজের চরিত্র-প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক সকলের ভালবাসা লাভ করিয়া, দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদিগকে যথাশক্তি দান করিয়া, পরিবারের ও আতুরদিগের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা নিজের নাম ধন্য করিয়া, পতিব্রতা সাধ্বীর মত পরমগুরু পতির চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া, মাতা পিতার হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া ও আমাদের দুঃখিনী বুলবুলকে মাতৃহারা করিয়া পরম-পিতার শান্তিনিকেতনে প্রস্থান করিল। অহো! হিরণের কথা মনে হইলে প্রাণে নিদারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ভগিনি! মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী আমরা সকলেই হিরণের শোকে কাতর হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এত শূন্য বোধ করি নাই। তুমি ছিলে, তোমার সঙ্গে প্রাণের কথাগুলি বলিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছি। ভগিনি! তুমিও চলিয়া যাওয়াতে প্রাণ মন সবই একবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে।

তুমি বিদ্যাশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, রন্ধন প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও বাদ্যে অতিশয় নিপুণা হইয়াছিলে। বাবা স্বহস্তে তোমাকে হারমোনিয়ম, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, তানপুরা বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন। ভগিনি, গৃহে

---

* আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্বামীরও বি, এল, পর্য্যন্ত অধ্যয়নের খরচ বাবা বহন করিয়াছিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠা সহোদরা বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে এবং স্বামীর নিকটেই অধিক সময় থাকিতেন। আমাদের জ্ঞানের অবস্থায় তাঁহাকে তিন চারি বারের অধিক দেখি নাই।

† ৩ বৎসর হইল আমাদের এই তৃতীয় ভগিনী ২২ বৎসর বয়সে স্বামীর কর্ম্মস্থল কটকে একটী ৩ বৎসরের কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করে। সেও অতিশয় বুদ্ধিমতী, গুণবতী ও রূপবতী ছিল।

সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি এখনও ঝুলিতেছে। তোমার সেই সুললিত রাগিণীঝঙ্কার এখনও কর্ণে যেন সুধা ঢালিয়া দিতেছে। দেশে, বিদেশে যেখানে তুমি গিয়াছ, যে তোমার অমায়িকভাবের কথা বার্ত্তা শুনিয়াছে, যে তোমার সুললিত রাগিণীর একবার আস্বাদ পাইয়াছে, সে যে তোমাকে সহজে ভুলিতে পারিবে এরূপ মনে হয় না। ব্রহ্মসঙ্গীতখানার অধিকাংশ গানই তোমার অভ্যস্ত ছিল, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মভাবোদ্দীপক ও সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ক যেখানে যে গান শুনিতে, তাহাই শিখিয়া ফেলিতে ও নিজের নিকট লিখিয়া রাখিতে। কত সময় গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজে তুমি সুমধুর সঙ্গীত গাহিয়া উপাসকমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছ। তুমি যখন অনুপস্থিত থাকিতে, তখন গৌহাটী মহিলা-সমিতি যেন প্রাণশূন্য অবস্থায় থাকিত। ভগিনি! তোমার সেই মধুমাখা সুললিত সঙ্গীতগুলি কেমন করিয়া ভুলিব? তোমার সেই প্রাণমনমুগ্ধকারী সঙ্গীতগুলি অহর্নিশ মনে জাগিতেছে।

পিতা মাতার প্রাণে চিরজীবনের জন্য আগুন জ্বালাইয়া, অসময়ে সম্যক্ প্রস্ফুটিতা না হইতে হইতেই তুমি চলিয়া গেলে কেন? কে তোমার পবিত্র ও কোমল প্রাণে আঘাত করিয়াছিল। পরম স্নেহশীল জনক, তোমার স্বামী শ্রীমান্ যামিনীকান্ত সেনকে ৬ বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়াইয়া, কত সাহেবকে অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সুখের সময়, তুমিও ঠিক পতিব্রতা হিরণের মত পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে নিজের স্বর্গীয় গুণাবলী বিকীর্ণ করিয়া, জনক-জননীর হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া, পতি, মাতা, পিতা, এই তিন পরম গুরুর ক্রোড় হইতে জ্যোতির্ম্ময় লোকে চলিয়া গেলে। * মৃত্যুর সময় স্বামিক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, মাতা পিতার গায়ে হাত রাখিয়া কি স্বর্গীয় শোভাই ধারণ করিয়াছিলে। হায় রে, তুমি একবারও ভাবিলে না যে, হিরণের শোক মা ও বাবা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। আবার এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া, ভাই ভগিনীর প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়া, স্নেহের পুতুলী অরুণকে মাতৃহীন করিয়া তুমিও চলিয়া গেলে। এ সংসারে অরুণকে তোমার মত কে আর সস্নেহ শাসনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যাইতে পারিবে?

ভগিনি! তোমার গুণের কথা কত বলিব! সাংসারিক নানা কার্য্যের মধ্যেও তুমি সার কর্ত্তব্যগুলি বাছিয়া লইয়াছিলে। তুমি পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ীর যত্ন ও সেবা, পরিবারস্থ রোগী প্রভৃতির শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান নিজে করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছ।

* মৃত্যুর ২ মাস পূর্ব্বে প্রিয়বালা পিরোজপুরে স্বামীর নিকট গমন করে। আমাদের পিতা, মাতা তখন গৌহাটীতে ছিলেন। তাহার পীড়ার সম্বাদ পাইয়া (আর্জেণ্ট টেলিগ্রামে) তাঁহারা উভয়ে প্রিয়বালার মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বে তথায় গিয়া উপস্থিত হন।

পতির সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তুমি নিতান্তই পতি-পরায়ণা ছিলে। কিরূপে স্বামীকে সুখে রাখিতে পারিবে, কিরূপে তাহার শরীরের পুষ্টিসাধন হইবে, সেইরূপ কার্য্য করাই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। নিতান্ত পতিব্রতা ছিলে বলিয়াই মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া জন্মের মত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া অন্তিমে পিতা মাতাকে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের নিকট চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে।

তুমি বড়ই সৌভাগ্যবতী ছিলে। ইহ-সংসারে থাকিয়া কখন দুঃখকষ্টের লেশ-মাত্র জানিতে পার নাই। কি শ্বশুরালয়ে, কি পিত্রালয়ে উভয়ত্রই অতিশয় আদরে ছিলে। এখন আবার স্বর্গীয় কুসুমের ন্যায় স্বর্গে বিকশিত হইবে। তোমার মত পবিত্র-হৃদয়া সংসারে শোভা পায় না; তাই বুঝি ভগবান্ উপযুক্ততানুসারে স্বর্গের ফুল স্বর্গে তুলিয়া লইলেন।

তোমার ন্যায় ঈশ্বরপরায়ণা, পতি-পরায়ণা, পিতৃমাতৃভক্ত, উপাসনাশীলা, সঙ্গীতনিপুণা, পবিত্রহৃদয়া স্ত্রীরত্ন যে ইহ-সংসারে অধিককাল থাকিবে না, ইহা পূর্ব্বেই আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে কেবল গীতা, বিবেকানন্দ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃত লইয়াই থাকিতে। সেই জন্য অনেক সময় আমরা তোমাকে বিদ্রূপ করিয়াছি। তুমি সাহসের সহিত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছ যে, আমি সংসারে নির্লিপ্তভাবে জীবন কাটাইব। তোমার সেই কথাই ঠিক হইল। তুমি কি তোমার জীবনের স্বল্পকালস্থায়িতা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলে?

ভগিনি! মা ও বাবাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ভাবিয়া পাই না। তুমি মা ও বাবার অতিশয় প্রিয় ছিলে। প্রত্যহ বাবার নিকট তোমার স্বহস্তলিখিত পত্র আসিত। পীড়া না হইলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে একদিনও পত্র আসা বাদ যাইত না। তোমাকে পত্র লেখা বাবারও প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে একটী কর্ত্তব্য ছিল। তুমি যখন পিত্রালয়ে থাকিতে, প্রত্যহ দুইবেলা মার সঙ্গে আহার করিতে। একদিন কেহ নিষেধ করিলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে। আহার করিতে বসিয়া ভাল ভাল খাবার দ্রব্য-গুলি মাকে দিতে। বাবার জন্য যে যে কার্য্যগুলি করিতে হইত, তাহা সুন্দর-রূপে নিজের হাতে সম্পন্ন করা তোমার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। বাবার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি এরূপভাবে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিয়া রাখিতে যে, সে সকলের জন্য বাবাকে কখন অভাব বোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে হয় নাই। তোমার সেই সাধু ব্যবহার, অমৃত-মাখা কথা, মধুর সঙ্গীত সবই রহিয়াছে, কেবল তুমিই নাই। অহো! এ ভীষণ ক্লেশ মা ও বাবা কি করিয়া সহ্য করিতেছেন! তুমি না

মা ও বাবাকে বড় ভাল বাসিতে? এই বুঝি ভালবাসার নিদর্শন! এই বুঝি সন্তানের প্রকৃত কর্ত্তব্যপালন!

ভগিনি, ভীষণ সংসারসাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া, সম্মুখে কর্ত্তব্যরাশি দেখিয়া যখন ভয় পাইয়াছি, তখন তুমিই অভয় প্রদান করিয়াছ, "দিদি ভয় কি, আমরা এতগুলি ভাই ভগ্নী আছি। আমরা কি ভ্রাতা ভগিনী নামে কলঙ্কারোপ করিব? কখনই নয়। একে অপরের সহায়তা করিব, অর্থে না পারি, কাজে যথাসম্ভব করিব।" আহা! কি মধুর শান্তিপ্রদ বাণী। পরমস্নেহময়ী হিরণও আমাকে এই একই আশার বাণী শুনাইয়াছে। আজ তোমাদের উভয়ের সেই ভালবাসা-জড়িত আশার বাণী কোথায় রহিল?

এ মহাপাপিয়সী দিদিকে ফেলিয়া পুণ্যবতী তোমরা স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছ। এখন এ সংসারে এমন পবিত্রতাপূর্ণ ভালবাসার কথা, দুঃখে সান্ত্বনার কথা, ভয়ে সাহসের কথা, অন্ধকারে আশার কথা কে আর কহিবে? কাহার নিকট প্রাণের সকল প্রকার সুখ দুঃখের ও নৈরাশ্যের কথা বলিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিব ও সময়োপযোগী সদুপদেশ পাইব? সংসারে দেখিতে পাই, প্রাণের প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যায় না। এখানে কেবল স্বার্থজড়িত ভালবাসা। এ ভালবাসাতে আস্থা স্থাপন করিলে বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাপবাদ, জীবনের শান্তিভঙ্গ, ঘোরতর অনিষ্ট ও প্রাণে নিদারুণ যাতনাভোগের ভয় থাকে। সংসারে আত্মীয় স্বজনের নিকট কোন একটা প্রাণের কথা বলিলে তাহারা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই কোন একটী ভাল কথারও বিপরীত অর্থগ্রহণ করিয়া নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা অনেক সময় কথাটীকে নানারূপ মিথ্যালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয় ও প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়া থাকে, কিন্তু কোন দোষ বা ত্রুটি লক্ষিত হইলে দোষটী প্রদর্শন করিয়া সৎপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না। তাই বলিতেছি সংসারে তোমার মত সুহৃদ আর পাইব না। আমরা তিনটী ভগিনী, এক সূত্রে গাঁথা ছিলাম। সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তিতে সমভাগিনী ছিলাম। প্রত্যেকে অপরের চরিত্র-সংশোধনের সহায় ছিলাম, বিপদাপদে আশ্রয়স্বরূপা ছিলাম। পরস্পরে অকপটচিত্তে সর্ব্ব প্রকার কথা বলিয়া প্রাণে আরাম অনুভব করিতাম। আমি নিশ্চয় জানি, এ জগতে আর এরূপ প্রাণের বন্ধু মিলিবে না। হিরণের পরলোকগমনের পরও তুমি ছিলে। তোমার সহবাসে হিরণের অভাব অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আবার তোমাকে হারাইয়া সংসার শূন্য মনে হইতেছে। তোমাদের ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে নিরতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাসিনী ছাত্রীদিগকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা শিখাইবার প্রধান উপায়—নিজে সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা। সতত জ্ঞানী লোকের সঙ্গে থাকিলে গণ্ডমূর্খও যেমন বিদ্যা শিখিতে অভিলাষী হয়, তেমনি তোমার সংসারের সুশৃঙ্খলতা ও তোমার পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিলে প্রতিবাসিনীগণ নিজ নিজ গৃহ ও পরিচ্ছদও বেশ সুন্দর করিতে উৎসুক হইবে। তোমার মার্জ্জিত কথাবার্ত্তা ও চাল চলন দেখিয়া তাহারা ভব্যতা ও শিষ্টাচার শিখিবে, এবং তাহাদের প্রতি তোমার নিঃস্বার্থ যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া তাহারা তোমাকে আপন বন্ধুর ন্যায় ভাবিবে। তাহারা নিজেই তোমাকে আপন পরিবারের কথা বলিবে ও তোমার পরামর্শ চাহিবে। আর তুমিও তাহাদের যথার্থ জ্ঞানদাত্রী জননীর ন্যায় সকল বিষয়ে তাহাদের চোক ফুটাইয়া দিবে।

সময় পাইলে কখন কখন ছাত্রীদিগকে ডাকিয়া তোমার ঘরে বা দালানে বসিয়া সেলাই করিতে বলিবে, আর তুমি তাহাদের কাছে কোন ভাল জীবনী বা উপকারী উপন্যাস পড়িবে। উহা দ্বারা তাদের হাত, কান ও মন এই তিন ইন্দ্রিয়ের একসঙ্গে চালনা হওয়াতে তাহারা শীঘ্র অধিকতর চতুর হইয়া উঠিবে। ছাত্রীরা না জানিলেও তুমি নিজেই তাহাদের জন্য জামা, কামিজ প্রভৃতি কাটিয়া দিবে ও তাহাদের ভাই ভগ্নী কিম্বা ছেলে মেয়েদের জন্য মোজা টুপি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বুনিতে শিখাইবে।

অনেক সময় কোন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রীর পীড়া হইলে তাঁহার সংসারে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। স্বামী গৃহকর্ম্মের জন্য আপনার কাজ কামাই করিতে বাধ্য হন, সময়ে আহারের অভাবে ছেলেরা স্কুলে যাইতে পায় না, খোকা দুধের অভাবে কাঁদিতে থাকে, গরুগুলি সময়ে জাব পায় না। এইরূপে সেই ক্ষুদ্র পরিবারে নানা গোলমাল উপস্থিত হয়। সে সময়ে কোন প্রতিবাসিনী আসিয়া তাঁহাদের গৃহকর্ম্মের ভার লইলে কতই না উপকার হয়! পীড়িত মাতার মুখে আবার হাসি উঠে, কুপিত বাপের চোখে শান্তি আসে, ছেলে মেয়েরা চোখের জল মুছিয়া ভাত খাইতে বইসে এবং শিশু ঝুমঝুমি লইয়া খেলা করে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে আহার করিয়া আপন আপন কাজে যান, অসুস্থ মাতা শান্তিতে বিশ্রাম করেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে দুই একদিন পরোপকার করিতে আমাদের কিছুই কষ্ট হয় না, অথচ ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল গৃহে শান্তি দেখিলে অন্তরে কি অপার আনন্দ হয়।

তুমি যদি কোণের বউ হও, বা প্রতিবাসিনীর বাড়ী যাইতে তোমার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে বিপদের সময় দাসী পাঠাইয়া তাহাদের সংবাদ লইবে, নিজের দাসী দ্বারা তাহাদের গৃহকাজ করাইয়া দিবে, আর আবশ্যক হইলে তাহাদের স্বামী সন্তানদিগকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে, কিম্বা পাচিকাকে দিয়া তাহাদের বাড়ীতে খাদ্য পাঠাইবে। ঐরূপ সময়ে সামান্য সাহায্যের দ্বারা কত লোকের কত ক্লেশ ও যন্ত্রণা নিবারণ করা যায়। আর পাড়ার কোন দরিদ্র স্ত্রীলোকের সন্তান হইলে তাহাকে তোমার ছেলেদের পুরাণ জামা মোজা ও ন্যাকড়া প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলে সে কতই আহ্লাদিত হইবে, আর ঐ অসুস্থাবস্থায় সে তোমার নিকট হইতে যথাসময়ে গরম দুধ, সাগু, চিঁড়েভাজা প্রভৃতি খাদ্য পাইলে কতই উপকৃত হইবে।

আর একটী বিষয়েও বঙ্গনারীগণের দাতব্যশক্তির চালনার একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও অসাবধানতাবশতঃ যে কত শিশুর অকালমৃত্যু ঘটে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ঐ অনিষ্টের মূলোৎপাটন করিতে হইলে জননীদিগকে ধাত্রী, সেবিকা ও মার কর্ত্তব্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে, নতুবা বঙ্গসন্তানদিগের হৃষ্ট পুষ্ট ও দীর্ঘজীবী হওয়া অসম্ভব। ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য পুরুষগণ তিন চারিখানি পুস্তক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে পুস্তকের উপদেশ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অতি অল্প নারীই সক্ষম। সাধারণতঃ অধিকাংশ জননী লেখা পড়া জানেন না, আর অনেকে পড়িতে জানিলেও পুস্তকের মূল্য তাঁহাদের পক্ষে বড় অধিক বোধ হয়। সুতরাং প্রতিবাসিনী সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা যদি তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিতা ভগিনীদিগকে ধাত্রীর কাজ ও মাতার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কত হাজার শিশুকে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উপায় হয়।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতার অভাবই শিশুদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ঐ দুটী বিষয়ে যত্ন করিলে কত শত ছেলে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে ও কত দুর্ব্বল ও অপুষ্ট সন্তান সুস্থ ও সবল হইবে। পাঠিকাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন অনেক পরদুঃখকাতরা নারী আছেন, যাঁহারা জানিবামাত্র ঐ সব শিশুদিগকে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হইবেন। উহার নিমিত্ত অধিক পয়সা বা ক্লেশের আবশ্যক নাই। কেবল চারিদিকস্থ দরিদ্র মাতাকে ডাকিয়া অপরিষ্কার স্থানে বাস ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কোমল শিশুদের পক্ষে যে কত অপকারী তাহা বুঝাইয়া দাও। তাহাদিগকে কাছে বসাইয়া বল, যে খোসপাঁচড়া, চুলকনা প্রভৃতি যত চর্ম্মরোগের প্রধান কারণ অপরিচ্ছন্নতা। বাসি দুধ ও মুড়িকড়াই ছেলেদের পেটে বিষের মত কাজ করে, আর পচা পুকুরের

জল ও পান্তা ভাত কাশি শ্লেষ্মার আকর স্বরূপ। তাহাদিগকে আরো বুঝাইয়া বল যে, অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত সূতিকাগৃহ সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে বাঘের গর্ত্তের চেয়েও অধিক ভয়ঙ্কর; আর সূতিকাগৃহের দিনরাত প্রকাণ্ড আগুন ও কাষ্ঠের ধোঁয়ায় শিশুর চোখের পীড়া হইবার একান্ত সম্ভাবনা। শীতকালে ছেলেকে খোলা গায়ে রাখিলে বা বর্ষাকালে ভিজে মাটিতে শোয়াইলে তাহারা শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়িবে ইত্যাদি।

এই সব গুরুতর বিষয়ে দুই চারিটা সৎপরামর্শ দিয়া কেহ যদি একটী শিশুরও প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে সেই ছেলের হাসি ও তাহার মাতার আনন্দ তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ হইবে।

বাড়ুক জ্ঞানের সহ শান্তি ধরাতলে,
জ্বলুক সত্যের জ্যোতিঃ সকলের ভালে।
প্রত্যেক হৃদয় হোক একত্র মিলিত
জ্ঞান, আশা, দয়া হয়ে বিশ্বাসে জড়িত।
সেই আশা—ধীরভাবে যাহা বহে ক্লেশে,
দেখে পাব বর্ত্তমান যাতনার শেষে।
সসংশয় দুঃখময় হিয়া প্রফুল্লিয়া,
বিশ্বাসে তাদিগে পুনঃ আনেরে ধরিয়া।
সেই দয়া—যাহা সদা শান্তি-বায়ু বয়,
তেয়াগিতে দ্বেষহিংসা সবে আদেশয়,
নিরাশ্রয়ে গৃহ দেয়, নিরুপায়ে ভাত,
অনাথ জনের কাজে রত দিন রাত।
সে বিশ্বাস—শিখায় যা প্রকৃতি নিয়ম,
স্বর্গীয় আদেশ যত স্বভাবের ক্রম।
সেই জ্ঞান—এ জগতে যাহে বুঝা যায়,
সুখ দুঃখ কি কারণে সদা আসে যায়।
এই সব ঈশ্বরের প্রীতিকর দান,
তার মধ্যে দয়া গুণ সবার প্রধান।

ধর্ম্মাচার্য্যের প্রয়োজনীয়তা।

এতদ্দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে ঘটক বলে। ঘটকগণ কোথায় কোন্ বর আছে এবং কোথায় কোন্ কন্যা আছে, তাহার সমস্ত সংবাদ লইয়া রাখে। তদ্ভিন্ন বর ও কন্যার গুণপণা ও বংশমর্য্যাদার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। যখন প্রয়োজন পড়ে, তখন বরের অভিভাবকের নিকট যাইয়া কন্যার, এবং কন্যার অভিভাবকগণের নিকট গমন করিয়া বরের গুণ ও বংশাবলীর বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকে। যদিও তাহারা কখন কখন অতিরঞ্জিত করিয়া কার্য্য-বিপত্তি ঘটাইয়া দেয়, তথাপি বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য যে এতাদৃশ ব্যক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। বর ও কন্যা উভয় পক্ষই ঘটকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পাত্রী পাত্রের

সংবাদ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করেন। ঘটকের সাহায্য ব্যতীত কোথাও কোথাও সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেরূপ সম্বন্ধনির্দ্ধারণের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সেরূপ স্থলেও পাত্র বা কন্যাপক্ষ অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইয়া থাকেন। প্রাচীন-কালের স্বয়ম্বর প্রথা বর্ত্তমান কালে এতদ্দেশে আদৌ প্রচলিত নাই। ইউরোপ প্রভৃতি স্থলে ঘটক বলিয়া কোন লোকের অস্তিত্ব দেখা যায় না বটে, তথাপি তথায়ও ঠিক পূর্ব্বকালের স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত নাই। প্রাচীনকালে স্বয়ম্বরপ্রথানুসারে কন্যা বরের কোন সংবাদ অবগত হইত না। সভাস্থলে উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে যাহার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইত, তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিত।

বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য যেরূপ মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সেরূপ মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন আছে কিনা? ঈশ্বর কি বস্তু, তাঁহার কি গুণ, সাধক কিছুই অবগত নহে। তাহার হৃদয়ে যখন ঈশ্বরলাভের বাসনার উদ্রেক হয়, তখন সে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অন্বেষণ করিবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন বর ও কন্যার পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা উভয়ে দুরবর্ত্তী স্থানে বাস করে। সুতরাং একে অন্যের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। কাজেই কোন মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে এ অভাব দূরীকৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও সাধকের মধ্যে সেরূপ স্থানের ব্যবধান নাই, প্রত্যুত ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। গীতার এক স্থলে লিখিত আছে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন সত্য কথা। যেমন দুইয়ে দুই যোগ করিলে চারি হয়, এইটি গণিতের একটী ধ্রুব সত্য, তেমনি ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা একটী মৌলিক বিষয়। কিন্তু তাহা হইলেও সকল মনুষ্যের সে জ্ঞান কোথায়? সে জ্ঞানলাভের নামই ঈশ্বরপ্রাপ্তি। সে জ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বাস করিয়া আমাকে চালাইতেছেন, এই জ্ঞান স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সে জ্ঞান জন্মিলে মানব সিদ্ধ পুরুষ হইয়া যায়, তাহার আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। যে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কস্তুরিকা মৃগের ন্যায় সুগন্ধের আধার কস্তুরিকা বহন করিয়াও নিজে তাহার সুগন্ধ প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। সে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলেও তাঁহাকে দূরবর্ত্তী মনে করেন।

সে ঈশ্বরকে দূরবর্ত্তী মনে করিয়া উপাসনা-কালে তাঁহাকে আহ্বান করে। নিম্ন শ্রেণীর উপাসকগণ কেবল ইষ্ট দেবতাকে আহ্বান করে এমত নহে, পূজাবসানে তাঁহাকে বিসর্জ্জনও করিয়া থাকে। অর্থাৎ যিনি দূরবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী করিয়া পূজা করিয়া, পূজান্তে আবার দূরবর্ত্তী করিয়া দেওয়া হয়। মধ্যম শ্রেণীর উপাসকগণ ঈশ্বরকে তদ্রূপ দূরবর্ত্তী না করিলেও তাঁহার ও নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবধানরূপ সীমারেখা টানিয়া লয়, অর্থাৎ ঈশ্বরকে তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করে, এবং নিজেরা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতে থাকে। এতাদৃশ অজ্ঞ লোকদিগকে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি ও কি উপায়ে তাহা স্থির হইতে পারে, এই সমস্ত অবগত করাইবার নিমিত্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ তত্তৎ বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া সেই সেই বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকারী। যে সকল ধর্ম্মপিপাসু লোক এতাদৃশ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগের ঈশ্বরলাভ নিশার স্বপ্নবৎ অলীক। তবে শাস্ত্রে এক শ্রেণীর মহাপুরুষের উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকে কৃপাসিদ্ধ বলিয়া থাকে। তাঁহাদিগকে স্বয়ম্বরা কন্যাদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা স্বভাবতঃই ঈশ্বরমুখী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের মনকে ঈশ্বরমুখী করিবার জন্য কোন আচার্য্যের উপদেশের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাদিগের গুরু হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যান। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি বিরল। সর্ব্বসাধারণের জন্য এ নিয়ম খাটিতে পারে না। যে কারণেই হউক, তাঁহাদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে অন্যান্য জীবের ন্যায় বাসনা-নিবৃত্তির জন্য তুমুল সংগ্রাম করিতে হয় না। তাঁহাদিগের পক্ষে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া অতি সহজ। তদ্ভিন্ন আর সকল লোককেই ধর্ম্মাচার্য্যগণের সাহায্যে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। সংগ্রামান্তে যখন কেহ গন্তব্য স্থলে পঁহুছিতে পারিবে, তখন তাহার পক্ষে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে। বর কন্যার সম্মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত ঘটকের প্রয়োজন। সম্মিলন হইবার পর যখন উভয়ে উভয়কে চিনিয়া লইল এবং প্রেমের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তখন আর কে ঘটকের অন্বেষণ করে? তখন উভয়ে প্রেমাবেশে প্রফুল্লভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে থাকে। ধর্ম্মার্থীর পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। ঈশ্বরের সহিত মিলন হইলে আর কে আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া থাকে। তখন উপাস্য উপাসক পরস্পর অভিন্ন মনে করিয়া একীভূত হইয়া যায়।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

সৌন্দর্য্য।

প্রীতি সৌন্দর্য্যের প্রাণ। যথায় প্রীতি নাই, যথায় প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতি নিপতিত হয় নাই, তথায় সৌন্দর্য্য আকাশ-কুসুম সদৃশ বা তদপেক্ষাও অলীক বা অসার বস্তু। আমি যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের অন্তরাল করিতে চাই না, যাহার চিন্তা প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে জীবন্ত জাগ্রতভাবে সমুদিত, তাহার বর্ণ কাকের ন্যায় বা তদপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হউক, শরীরের গঠন সাধারণ মানবচক্ষে যতদূর সম্ভব কদাকার হউক, আকার ইঙ্গিত ভাবভঙ্গী অন্যের নিকট ভদ্রজনোচিত বা সভ্যতার অনুমোদিত না হউক, আমার নিকট সেই মূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের সার, ‘লাবণ্যের খনি, জগতে একান্ত স্পৃহণীয় পদার্থ। কেন এমন? আমার চক্ষু কি তবে বিকৃত,দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ? যদি তাহা না হয়, তবে কি সাধারণ মানবসমাজের চক্ষু বিকৃত? তাহাও যদি অসম্ভব হয়, তবে এ প্রহেলিকার কারণ কি? আসুন, বন্ধুগণ! একবার সেই কারণ অনুসন্ধান করি।

এক কার্য্যের বিভিন্ন কারণ থাকে। রাম বাবুর জর হইল, বৃষ্টিতে ভিজিয়া হইতে পারে; কোষ্ঠবদ্ধ হইয়াও হইতে পারে; অতিশয় শীতাতপ সম্ভোগবশতঃও হইতে পারে। এইরূপ কোন এক কারণে বা কারণ সকলের সমবায়ে জর হইতে পারে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু এ স্থলে কোন্ কারণে জর হইল, তাহা অবধারিত না হইলে ত চিকিৎসা হইবে না, সুতরাং সুচিকিৎসককে প্রথমে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। কার্য্যকারণশৃঙ্খলার মূল অন্বেষণ করিতে করিতে যখন আমরা প্রস্রবণে উপনীত হইব, তখন দেখিব, মূল বা প্রাথমিক কারণ একটী, অন্য সকলগুলি তদুৎপন্ন ও তৎসহকারী। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই। অমুকের বর্ণ উত্তম গৌর, ঈষৎ লোহিতাভ, সুতরাং সে সুন্দর; যদি আমি এই কথা বলি, তবে বুঝিতে হইবে লোহিত আভাযুক্ত গৌর বর্ণই আমি দেখিতে ভালবাসি, সুতরাং আমার চক্ষে ঐ বর্ণই সুন্দর। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন লোকের রুচি যখন বিভিন্নরূপ, তখন যদি কেহ চাক্‌চিক্য-ময় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেই ভালবাসে, তবে তাহার নিকট তাদৃশ বর্ণের লোকই যে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। বর্ণ সম্বন্ধে যেমন, শরীরের গঠন, আকার ইঙ্গিত, ভাব ভঙ্গী, সকল বিষয়েই সেইরূপ। লোকে আপনার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে, দেশকালের দুরতিক্রম্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া মনোমন্দিরে সৌন্দর্য্যের একটি আদর্শ প্রস্তুত করে। সে আদর্শের সহিত যাহা মিলে,

তাহাই প্রীতিকর, সুতরাং তাহাই সুন্দর। চীনের লোকের পক্ষে এই কারণে খর্ব্বাকৃতি সৌন্দর্য্যের সার, ইংরাজসম্প্রদায়ের মধ্যে এই কারণেই বামাদলের ক্ষীণ কটিদেশ সুগঠনের চরম সীমা।

এ ত গেল সৌন্দর্য্যের বহিরাভরণ—শুধু প্রতিবিম্ব মাত্র। একবার ভিতরের দিক দেখা যাউক্। সময়ে সময়ে আমরা দেখি, দুইজন লোকের বর্ণ ও আকৃতি অনেকটা এক প্রকার, আমাদের হৃদয়-নিহিত সৌন্দর্য্যের আদর্শের সঙ্গেও ঐক্য হইতেছে অথচ একজনকে দেখিয়া প্রীত হইতেছি, দেখিয়া দেখিয়া দর্শনের আশা মিটিতেছে না, কিন্তু অন্যের দিকে চাহিয়া দেখিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। মনে হইতেছে, শীঘ্র সম্মুখ হইতে অপসারিত হউক। ইহার কারণ কি? মাতার নিকট আপনার পুত্রের মূর্ত্তি ও তদনুরূপ একটী নিঃসম্পর্কীয় লোকের মূর্ত্তি কি কখনও সমান প্রীতিকর হইতে পারে? এরূপ ঘটনা আমাদের নয়নসমক্ষে অহরহ সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং শারীরিক বর্ণ ও গঠন ত এ ভালবাসাবৈচিত্র্যের কারণ হইতে পারে না। ইহার কারণ অন্যরূপ।

মুখ মনের ভাবব্যঞ্জক দর্পণ স্বরূপ। মনের ভাব মুখে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই আমরা কাহারও হাসিমাখা মুখখানি দেখিলে তাহার হৃদয়ে আনন্দের সত্তা অনুভব করি। আবার কাহারও চক্ষুতে অশ্রুধারা এবং মুখ তিমিরবৎ কালিমায় সমাচ্ছন্ন দেখিলে তাহার হৃদয় যে বিষাদপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারি। তাই বলিতেছিলাম, মুখ মনোগত ভাবব্যঞ্জক দর্পণ। এরূপ যদি না হইত, তবে কি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণের লেশমাত্র না পাইয়াও কেবল আশঙ্কাপূর্ণ, ভীতিব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া কাহাকেও কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্থির করিতে পারিতেন? আমরা সকল সময়ে মুখ দেখিয়া লোকের মনোভাব অনুমান করিতে পারি না বটে, কিন্তু সাংসারিক জীবনে অনেক সময়ই আমরা একজন উদারচেতা সাধুচরিত্র লোকের মধুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথম দর্শনেই তাঁহার গুণগ্রাম উপলব্ধি করিয়া কি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হই না? আবার একজন কপটাচারী নৃশংস পিশাচের পিশাচপ্রকৃতি তাহার মুখে প্রতিফলিত দেখিয়া কি ভয়ে তাহা হইতে শত হস্ত দূরে সরিয়া যাই না? সুতরাং এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, মুখ মনোভাবব্যঞ্জক দর্পণ স্বরূপ। যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা কিছুতেই কুটিলতাময় আবরণে অন্তরের ভাব অধিক দিন লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ হই না। যাঁহারা নরহন্তা নৃশংস মানবের প্রতি পাদবিক্ষেপে আশঙ্কাপূর্ণ আকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার সত্যতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, বাহ্যিক রূপ রূপই নহে, ভিতরের রূপের গুণগ্রামের

অভিব্যক্তিমাত্র।" সেই ভিতরের রূপ বা মনুষ্যত্বের আদর্শ সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। কোথায় কোন্ সভ্যজাতি দয়ালুকে আদর না করে ও নৃশংসকে ঘৃণা না করে? কোথায় কোন্ সভ্যজাতি পরার্থপরতাকে স্বার্থপরতার বহু উচ্চে স্থান দান না করে? কোথায় কোন্ সভ্য জাতি দুষ্কার্য্য করিলে অনুতপ্ত না হয় ও সৎকার্য্য করিলে আত্মপ্রসাদসুখ সম্ভোগ না করে? বস্তুতঃ মানুষ যতই ধর্ম্মের উন্নত স্তরে আরোহণ করিতেছে, ততই দেখা যাইতেছে, সামান্য সামান্য বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও ধর্ম্ম ও নীতির মূলতত্ত্বে সকলেরই ধারণা প্রায় একরূপ। সুতরাং ভিতরের রূপ বা মনুষ্যত্বের আদর্শ সভ্যজগতে সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। তাই ইংরেজমহিলা কুমারী কার্পেণ্টার বিভিন্নজাতীয় বিভিন্নরুচিসম্পন্ন লোকের আবাসভূমি ভারতে আসিয়া এত আদৃত হইয়াছিলেন। তখন ভারতে কেহ কি তাঁহার বাহ্যিক রূপের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিয়াছিল? না—তদীয় বিশ্ব-স্বীকৃত গুণাবলীর স্বর্গীয় জ্যোতিঃ মুখমণ্ডলে প্রতিভাত দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ-ভাবে সেই পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া প্রীতি অনুভব করিয়াছিল? তাই মহাত্মা বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকা মহাদ্বীপে আপনার জ্ঞানের, চরিত্রের, ধর্ম্মভাবের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া বিজাতীয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী জাতিকে বিস্ময়স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন কি আমেরিকাবাসীগণ তাঁহাদের হৃদয়নিহিত বাহ্যিক রূপের আদর্শে তদীয় শরীর গঠিত নহে বলিয়া ঘৃণান্ধ তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল? না—বাহ্যিক রূপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তদীয় আভ্যন্তরীণ রূপে বিমোহিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল? এই আভ্যন্তরীণ রূপ আকৃতিতে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া আমরা যাহার প্রতি অনুরক্ত হই, সে যতই কৃষ্ণবর্ণ হউক, তাহার বাহ্যিক গঠন যতদূর সম্ভব কদাকার হউক, আকার ইঙ্গিত যতদূরসম্ভব সভ্যরীতির বিপরীত হউক, আমাদের চক্ষুতে সে পরম সুন্দর।

এখন দেখা যাউক, সেই আভ্যন্তরীণ রূপের উপকরণ কি কি। চরিত্র কি ভাবে গঠিত হইলে, হৃদয় কি কি গুণগ্রামে সমালঙ্কৃত হইলে, সেই ভিতরের রূপ সমুৎপন্ন হইতে এবং ফুটিয়া বাহির হইয়া চিত্তকে বিমোহিত করিতে পারে। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটী কথায় ইহার সুন্দর আভাস দিয়াছেন। সাধুতাই যে সৌন্দর্য্যের প্রাণ, তাহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া তিনি গাহিয়াছেন;—

" * * তরুলতা ভূধর সাগর
বাসন্তী পূর্ণিমা, নারী, সকলি সুন্দর,
তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবি মনে
সাধুর প্রসন্ন মুখে, যখন নির্জ্জনে
যোগমগ্ন দেখি তাঁরে, যে সৌন্দর্য্য দেখি,
তার অনুরূপ শোভা কভু না নিরখি।"

—হিমাদ্রি কুসুম।

বস্তুতঃ যে হৃদয় পবিত্রতার স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, যে হৃদয়ে লোকে প্রেম, জীবে দয়া, নারায়ণে ভক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে জাগরিত, সে হৃদয়ের জ্যোতি যে মুখে প্রতিবিম্বিত হয়, সে মুখ রমণীয় হইবে না কেন, সে মুখের মাধুরী মানব-মন মোহিত করিবে না কেন? কবি আবার পরক্ষণেই গাহিয়াছেন ;—

"যা দেখিলে, যা শুনিলে প্রাণ সমুন্নত,
নীচ কুবাসনা হরে, পশুভাব যত
লজ্জা পায়, দেবভাব ফুটে ফুটে উঠে ;
স্বর্গীয় সৌরভ যেন প্রাণমধ্যে ছুটে ;
আমি বলি ধরামাঝে সেইত সুন্দর,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অরূপ সে রূপ মনোহর।"

—হিমাদ্রি-কুসুম।

কিন্তু এ সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অনুভূতি অনেকটা অনুশীলনসাপেক্ষ। সুনিপুণ গায়ক যখন বিশুদ্ধ তানলয় সহযোগে গান করিতে থাকেন, উৎকৃষ্ট বাদ্যকর যখন হারমোনিয়ম্ বা অন্যবিধ যন্ত্রে মধুময়ী রাগিণী আলাপ করিতে থাকেন, তখন শ্রোতারা সকলেই কি সে মাধুর্য্য সমভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন? তদুত্তরে আমরা বলিব—"না।" কখনই সকলে সে রস সমভাবে উপভোগ করিতে পারেন না। যে শ্রোতা সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ, রাগরাগিণীতে অভিজ্ঞ, তিনিই সেই গানের ও বাদ্যের অন্তঃস্থলে নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন ও বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে স্বরলহরীতে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দেন। অন্যেরাও সুখী হয় বটে, কিন্তু তাহাদের সে সুখ কখনই তত তলস্পর্শী হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া কর্ণের সুখসাধন করে মাত্র। সুতরাং সঙ্গীতের প্রীতি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করা সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা-সাপেক্ষ। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যাহা হইতে সৌন্দর্য্য সমুৎপন্ন, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অনুভূতি আদৌ অসম্ভব। প্রজাপতির পাখা সুন্দর, সকলেই বলে, কিন্তু কেন সুন্দর! তাহার তত্ত্বান্বেষণ করে কয় জনে? যে চিত্রকর এই পাখাতে ভগবানের শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করেন, তিনি দেখিতে পান যে, যে বর্ণের পার্শ্বে যে বর্ণ সন্নিবেশিত করিলে চিত্রখানা মনোরম হয়, যে ভাবে দুই বা ততোধিক মূল বর্ণের রাসায়নিক মিশ্রণে নূতনবিধ চিত্তমুগ্ধকর মিশ্র বর্ণের উৎপত্তি হয়, যেখানে যে ভাবে পরমাণুপুঞ্জ সন্নিবেশিত করিলে রমণীয় আকার উৎপন্ন হয়, প্রজাপতির পক্ষ-অঙ্কনে তাহার কণিকামাত্র ত্রুটি কোথায়ও হয় নাই। তাই তিনি প্রজাপতির পক্ষদর্শনে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিয়া যেরূপ পরম আনন্দ উপভোগ করেন, অন্যেরা সেরূপ তলস্পর্শ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের চক্ষুতে এ সৌন্দর্য্য যৎসামান্য। সেইরূপ সকলেই সাধুর আকৃতি সুন্দর বলে। কিন্তু কি গুণে সাধুর মুখে এত মধুরতা, কি কি গুণে সাধুর

হৃদয় এত সুশোভিত, অল্প লোকেই তাহার তত্ত্ব লয়। যে সেই মধুরতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে কি তাহাতে অনুরক্ত না হইয়া, তদীয় হৃদয়নিহিত দেবভাবের অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারে? তাই বলিতেছিলাম, এ পবিত্র সৌন্দর্য্যের অনুভূতিও অনেকটা অনুশীলন-সাপেক্ষ।

"আকৃতি দর্শনে পশুভাব লজ্জা পায় ও দেবভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।" কবির এ কথাটী সহজ বিবেচনায় আপাততঃ সত্যের ভিত্তিতে সংস্থাপিত নহে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে পশুপ্রকৃতি মানব সাধুর রূপজ্যোতিতে পরিশোধিত হইয়া অগ্নিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় শোভা পায়, সেই মানব নিশ্চয়ই সাধুহৃদয়ের দেবপ্রকৃতির পরিচয় তদীয় মুখমণ্ডলে বিকাশিত দেখিয়াছে; নতুবা সাধুর আকৃতিতে এত মাধুর্য্য সে দেখিতে পাইবে কেন? সাধুর এ সৌন্দর্য্য ত রূপের নহে, বসনভূষণের নহে, উজ্জ্বল বর্ণের নহে, এ সৌন্দর্য্য সরলতামিশ্রিত পবিত্রতার, ভক্তিমিশ্রিত মহত্বের, সহানুভূতি-মিশ্রিত দয়ার। সুতরাং এ সকল গুণের পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত সে মুখে ও সামান্য মনুষ্যের মুখে প্রভেদ কি? আর পাপী যদি সাধুর হৃদয়নিহিত সেই দেবভাবের পরিচয়ই পায়, তবে কি সেই মুহূর্ত্তে নিজের নীচতা ও পশুভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না? তবে কি তাহার হৃদয় সংশোধিত হইবার জন্য উত্তেজিত হয় না? তবে কি সে অসৎ সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া সৎসংসর্গের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে না? এ যদি হইল, তবে আর তাহার হৃদয়ে দেবভাব জাগিতে বাকি কি?

যে সৌন্দর্য্যের এমন মহিমা, যাহা পাপ, তাপ, মলিনতা বিধৌত করিতে সমর্থ, যাহা মানবে ভগবানের বিশেষ করুণার পরিচায়ক, এমন সৌন্দর্য্যকে বুদ্ধিদোষে আমরা পদে পদে খর্ব্ব করিতেছি, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? অতি আহারে বা অনাহারে, অতি নিদ্রায় বা অনিদ্রায়, অতি পরিশ্রমে বা বিনা পরিশ্রমে, এইরূপ কত শত শারীরিক অনিয়মে পদে পদে স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া সুগঠিত সুগোল অবয়বকে কঙ্কালে পরিণত করিতেছি এবং লাবণ্যময় আকৃতি হারাইয়া মর্কটাকার ধারণ করিতেছি। স্বার্থপরতায় ডুবিয়া, বিলাসসুখে প্রমত্ত হইয়া, বাল্যের সেই সরলতাময় পবিত্রতা হারাইয়া পশুতে পরিণত হইতেছি, এবং স্বাভাবিক স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া নৃশংস পিশাচ হইয়া পড়িতেছি। শরীরের, হৃদয়ের, আত্মার পবিত্র সৌন্দর্য্য হারাইয়া এক দিকে যতদূর সম্ভব কদাকার হইয়া পড়িতেছি, অপর দিকে অন্তরে সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। ইহা কি অধঃপতনের চিহ্ন নহে? ইহা কি মোহান্ধতা নয়?

বলিতে দুঃখ হয়, বর্ত্তমান যুগে এ

মোহান্ধতা বাঙ্গালীজীবনে এক প্রকার সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে যে ইহার বিপরীত হয় না, স্থানে স্থানে যে পবিত্র সৌন্দর্য্যজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয় না, তাহা বলিতেছি না। তবে দেশের যাহা সাধারণ অবস্থা, তাহাই বলিতেছি। অনেকেরই নিকট ধর্ম্ম কেবল কথায়, কার্য্যে নহে; নীতি কেবল বাহিরে, হৃদয়ে নহে; আহার কেবল রসনার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে, স্বাস্থ্যসাধনোদ্দেশে নহে। এ ভাব যে পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে। এমনও এক দিন ছিল, যখন এ দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, যখন এতদ্দেশবাসীদের হৃদয় জ্ঞানে সমুন্নত, নীতিতে সুশোভিত, ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত ছিল। আর বুদ্ধিদোষে আজ আমাদের এই অবস্থা। ভগবান্ কি স্রোত ফিরাইবেন না? এ অধঃপতিত জাতিকে কি আর ধর্ম্মের উন্নত পথে প্রধাবিত করিবেন না? আবার পবিত্র সৌন্দর্য্যে সমালঙ্কৃত করিবেন না?

নাড়ীপরীক্ষা।

(১) পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলির পরস্থিত তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা মনোযোগের সহিত উক্ত স্থান স্পর্শ করতঃ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া শারীরিক সুখ (স্বাস্থ্য) ও দুঃখ (রোগ) অবগত হওয়া যায়। স্নানের অব্যবহিত পরে ও নিদ্রিত অবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা করিতে নাই এবং ক্ষুধিত, পিপাসার্ত্ত, আতপতাপিত বা ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তিরও নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ঐ সকল অবস্থায় নাড়ীর গতি সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে পারা যায় না।

(২) বায়ুর আধিক্যে তর্জ্জনীতে, পিত্তাধিক্যে মধ্যমাতে এবং কফের আধিক্যে অনামিকাতে নাড়ীর স্ফুরণ অধিক অনুভূত হয়। বাত-পিত্তাধিক্যে তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যস্থলে, বাত-শ্লেষ্মার আধিক্যে অনামিকা ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থলে এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার প্রকোপে মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যস্থলে নাড়ীর স্পন্দন অধিক অনুভূত হয়।

(৩) সান্নিপাতে তিন অঙ্গুলিতেই নাড়ী অনুভূত হয়। বাতাধিক্যে নাড়ী বক্রগতি-বিশিষ্ট, পিত্তাধিক্যে উৎপ্লুতগতিবিশিষ্ট, কফের প্রকোপে নাড়ী ধীরগতি এবং সন্নিপাতে অতিশয় দ্রুতগতি হইয়া থাকে।

(৪) বাত-পিত্তাধিক্যে নাড়ী বক্র ও উৎপ্লুতগতিবিশিষ্ট, বাতশ্লেষ্মাধিক্যে নাড়ী বক্র ও ধীরগতি, এবং কফপিত্তাধিক্যে

নাড়ী উৎপ্লুতগতি ও ধীরগতি বিশিষ্ট হয়।

(৫) বমনেচ্ছা বা ক্রোধ উপস্থিত হইলে নাড়ী দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয় এবং চিন্তা বা ভয় উপস্থিত হইলে নাড়ী ক্ষীণতর হইয়া থাকে।

(৬) যদ্যপি নাড়ী কখন স্পন্দিত হয়, কখনও বা স্পন্দিত হয় না, অথবা স্বস্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে রোগীর জীবন রক্ষা হয় না। নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলে কিম্বা অত্যন্ত শীতল হইলেও রোগীর জীবিনের আশা থাকেনা।

(৭) জ্বরের প্রকোপে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হয়। মন্দাগ্নি এবং ক্ষীণধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ী মন্দগতি হয়। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চল এবং তৃপ্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থির ভাবে স্পন্দিত হয়। সুখী লোকের নাড়ী স্থির ভাবে স্পন্দিত এবং বলবতী হয়।

অসাধ্য নাড়ীপরীক্ষা—মন্দং মন্দং শিথিল-শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা। স্থিত্বা স্থিত্বা বহতী ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা॥ নিত্যাস্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্বা। ভাবৈরেবম্বিধবহুবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা॥

যে নাড়ীর গতি সূক্ষ্ম, অতি মৃদু, কোন সময়ে অনুভূত হয়, কোন সময়ে বা অনুভূত হয় না, কোন সময়ে বা চঞ্চলগতিও অনুভব হয়, কোন সময়ে থামিয়া থামিয়া গতি হয়, স্থান-চ্যুত অর্থাৎ যথাস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্নভাগে নাড়ীর গমন প্রতীত হয়; নাড়ীর এবম্বিধ লক্ষণাদি অনুমিত হইলে মৃত্যু সন্নিহিত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। আর সান্নিপাত-জ্বর সম্বন্ধীয় নাড়ীতেও মৃত্যু অবধারিত মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

৮। অর্শ রোগের মহৌষধ—উচ্ছে পাতার রস এক ছটাক করিয়া প্রত্যহ খাইলে উপকার হয়। আর যদি যন্ত্রণা হয়, তাহা হইলে কলমী শাকের ডগা কাটিয়া সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ভুজ্জিপত্র গাছের দক্ষিণ দিকের শিকড় একটী মাদুলি পুরিয়া কোমরে ধারণ করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

২। কোষ্ঠবদ্ধের সদুপায়—কালাদানা আধপোয়া, জাঙ্গি হরিতকী আধপোয়া, এই উভয় দ্রব্য অল্প ঘৃতে ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে। পরে রাত্রে শুইতে যাইবার সময় গরম দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবে। ইহাতে পরিষ্কার দাস্ত হয়। খাইবার নিয়ম বয়স্ক লোকদের এক তোলা, আর বালকদের আধ তোলা।

৩। ঋতু বন্ধের প্রতিকার—স্ত্রীলোকদের ঋতু না হইলে, কিম্বা ঋতু হইতে বিলম্ব হইলে ১০০ বৎসরের কাঁজি, আর পানগাছের শিকড়, এই উভয় দ্রব্য বাটিয়া খাওয়াইলে ঋতু হইবে; এক ছটাক করিয়া পনর দিন এইরূপ খাওয়াইবে।

৪। ঘা, পচা ঘা এবং কাউর ঘায়ের মহৌষধ—শ্বেত বেড়েলার শিকড় বাটিয়া ঘায়ে দিলে ঘা আরোগ্য হয়। শকুনির বিষ্ঠাতে পচা ঘা আরোগ্য হয়। শেয়ালের বিষ্ঠাতে কাউর ঘা আরোগ্য হয়, কিম্বা ভিমরুলের চাক পোড়াইয়া তৈলে ফেনাইয়া কাউর ঘায়ে দিলে শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যায়।

৫। নালী ঘায়ের মহৌষধ—অশ্বত্থের কাঁচুলি (ছাল), একটী জাঙ্গি হরীতকী, একটী চিকি সুপারি, ছটাথানি (অত্যল্প) আতপ চাল, এই সমস্ত দ্রব্য ভাজিয়া লইবে; চোঁয়া চোঁয়া হইলে নামাইয়া গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে, পরে নালী ঘায়ে দিলে সত্বর ঘা পুরিয়া উঠিবে। হাপরমালী গাছের আঠাতেও নালী ঘা আরোগ্য হয়।

৬। গরলের ঔষধ—বিষ কাঁঠাল (কুকুরছড়ি গাছ) গাছের পাতার রসে গরল আরোগ্য হয়, এমন কি বাঘের গরল পর্য্যন্তও আরোগ্য হইয়া থাকে। বিষকাঁঠাল সর্পদংশনের মহৌষধ। আফুলো বেল গাছের শিকড় হাতে রাখিলে সর্প কামড়াইবার ভয় থাকে না।

৭। কাল তুলসী গাছের শিকড়ে, পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। আর এই গাছের শিকড় (যে গাছে মুকুল ধরিয়াছে) মাদুলীতে পুরিয়া গলায় রাখিলে কোনরূপ দৃষ্টি বা বানমারা লাগে না; এমন কি ভূতের ভয়ও থাকে না।

৮। সন্ন্যাসীপ্রদত্ত মৃগীরোগের ঔষধ—পুরাতন মড়ার মাথা চূর্ণ ও মরীচচূর্ণ, এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে ২।১টী পোকা বাহির হয় ও মৃগীরোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

৯। ক্রিমির ঔষধ—বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। পলাশবীজ বাটিয়া মধুসহ ভক্ষণ করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। নিমপাতার রস মধুর প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৬ই চৈত্র যোধপুরের মহারাজ বাহাদুর বাতশ্লেষ্মা রোগে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

২। পৃথিবীস্থ নরপতিগণের মধ্যে

মিশরের রাজা ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণী, ইতালী, আরবী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারেন।

৩। শ্রীমতী আনি বেশান্ত কলিকাতায় আসিয়া করিন্থিয়ান্ থিয়েটারে ও টাউন-হলে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর ও দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা স্ত্রী-হাঁসপাতালে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। রামনগরের নবাব বাহাদুরের লাইব্রেরীতে বাদসাহ বাবর সাহের রচিত একখানি কবিতা পুস্তক আছে। উক্ত পুস্তকের কবিতাগুলি এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পুস্তকখানির অনেকগুলি পৃষ্ঠা বাবর সাহের স্বহস্ত-লিখিত। সেই পৃষ্ঠাগুলির ফটোও উক্ত পত্রিকায় দেওয়া হইতেছে।

৬। মিঃ আমির আলির চেষ্টায় লণ্ডনে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার কথা হইতেছে। তুরস্কের সুলতান ইহার জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৭। লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের ছাত্রাবাস-পরিদর্শনের সুফল ফলিয়াছে। গভর্ণমেন্ট আগামী বৎসর ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৮। জাপানের চিকিৎসকগণ চিকিৎসার জন্য কোন দর্শনীর দাবী করেন না, এরূপ শুনা যায়। গরীব দুঃখীদিগের নিকট হইতে কখনও অর্থগ্রহণ করেন না। সেখানে প্রবাদ আছে, রোগ ও দারিদ্রতা দুই ভাই যখন কোন পরিবারে প্রবেশ করে, তখন সেই পরিবারের নিকট হইতে যে চিকিৎসক অর্থ গ্রহণ করে, সে তস্কর।

৯। লাহোরে স্ত্রীলোকদিগের একটী সমিতি গঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সমিতিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় মহিলাগণ যোগদান করিতে পারিবেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য শিশুর অকালমৃত্যু রোধ করা।

১০। যশোহরের লক্ষ্মীপাশা গ্রামে অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার পাঁচ হাত লম্বা একটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন।

১১। শুনা যাইতেছে ইংলণ্ডে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে কয়েকজন লোকের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় ৮০ জন লোক রোগে ভুগিতেছে।

বামারচনা।

ইন্দ্রপতন।

কেন হাহারবে আজি পূরিত এ আর্য্যদেশ?
কেনগো ভারতমাতা পরিয়াছে শোকবেশ?
পবন গগনময়
বিষাদহিল্লোল বয়,
স্তব্ধ ব্যোম, বসুন্ধরা কেন উচ্ছ্বসিত হায়!
সকরুণ শোকগীতি ঘরে ঘরে সবে গায়!

কন্যা কুমারিকা হ'তে সুদূর সে হিমাচল—
কি বিরাট শোকোচ্ছ্বাসে মুছিতেছে আখি-
জল!
প্রকৃতির মুখে আর,
নাহি সে সুষমাভার,
রবি শশী তারাকুল কেন সবে ম্রিয়মাণ?
বিষাদবিহ্বল আজি কেন বিশ্ববাসি-প্রাণ?

পাশ্চাত্য ভূখণ্ড ভরি একি শুনি হাহাকার!
বৃটনের মহারাজ এডোয়ার্ড নাহি আর!
তাই শূন্য আজি সব,
তাই এই হাহারব,
ইংলণ্ড ভারত তাই ঢালে অশ্রু বেদনায়।
শোকভরা বসুন্ধরা তাই সব অন্ধকার।

উদার মহৎ শান্ত সহৃদয় গুনবান্,
সদাশয় সুচরিত্র পুণ্যহৃদি যশস্বান্,
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-নেতা
কর্ম্মবীর দৃঢ়চেতা,
ক্ষমাশীল ন্যায়বান্ সৌজন্যের অবতার।
প্রকৃতিরঞ্জনকারী প্রতিমূর্ত্তি করুণার।

মহারাজ পরাক্রান্ত জগতবিখ্যাত নাম—
রিপুকুল নতশিরে করে স্তুতি অবিরাম,
দিগন্ত প্রসার যাঁর,
বিশাল সাম্রাজ্যভার,
ভ্রমেও কখন রবি নাহি হয় অস্তমিত,
সগৌরবে সমুজ্জ্বল সদা রাজ্যে সমুদিত।

ব্রিটিশ ভাস্বর রবি সে ভারতমিত্র রাজ,
ডুবিয়াছে অস্তাচলে বৃটন-গৌরব আজ।
সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি,
ভুবনবিশ্রুত কীর্ত্তি,
সে আদর্শ নরপতি আজি হায় চলে গেল!
প্রকৃতিপুঞ্জের বক্ষে হানি তীক্ষ্ণ শোকশেল।

সসাগরা অধিপতি সার্ব্বভৌম মহারাজ,
মহাকালপরশনে কর্ম্ম অবসান আজ,
হে রাজেন্দ্র পুণ্যহৃদি!
ভারতের ভাগ্যবিধি!
বৈজয়ন্ত ধাম হের সজ্জিত তোমার তরে—
রাণীমাতা ভিক্টোরিয়া দাঁড়াইয়া স্নেহভরে।

শিরস চুম্বন করি লইতে তোমায় বক্ষে,
মিলনের অশ্রুপাত ঝরে ইন্দিবর-চক্ষে,
যাও তবে মহারাজ!
কর্ম্মোচিত ধামে আজ,
সাধনার সিদ্ধি অই উন্মুক্ত স্বরগদ্বার,
সাদরে দেবেন্দ্র গলে অর্পিবেন প্রীতিহার।

কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কীর্ত্তির নাহিক ক্ষয়।
'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' তাহার নাহিক লয়।
তোমার সে কীর্ত্তিগান,
গাবে বিশ্ববাসি-প্রাণ,
যত দিন রবি শশী উদিবে এ ধরাধামে।
পুষ্পাঞ্জলি দিবে প্রজা তব অই পুণ্য নামে।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

সমাধিপাশে।

নীরব এ সমাধির নীরব ছায়ায়
নীরব কমলাতীরে *
নীরব চিতার পরে
ঘুমাইয়ে থাক ভাই ! অনন্ত নিদ্রায়।
ধরণীর কোলাহল প্রীতি প্রস্রবণ।
প্রকৃতির বীণাতান,
পাখীর ললিত গান,
পারিবে না আর তোরে জাগাতে কখন।
হেথা তুমি থাক দাদা ! হয়ে নিমগন
নীরব সমাধিকূলে,
তন্ময় পরাণ খুলে,
যোগে মগ্ন যোগীশ্বর বিহরে যেমন।
হেথায় বহিবে ধীরে সৌরভসম্ভার,
বরষা ঢালিবে জল,
জননী দিবেন কোল,
প্রকৃতি তন্ময় হয়ে বাজাবে সেতার।
ঘুমাও ঘুমাও ভাই ! অনন্ত নিদ্রায়।
আমি নিত্য হেথা বসি,
এ সমাধিপাশে বসি,
আঁকিব তোমার ছবি চিরমধুময় ॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

* দ্বারভাঙ্গার প্রসিদ্ধ নদী।

প্রতিষ্ঠা।

দূরে থাক দেবতা আমার !
চেয়ে রব সতৃষ্ণ নয়নে,
হিয়ামাঝে মধুর মূরতি
এঁকে ল'ব নিভৃত গোপনে।
অতীতের সুখ দুঃখ যত
অতীতেই থাকুক লুকানো,
ছুটে যাক্ মর্ম্মের বন্ধন,
ভেঙ্গে যাক্ হৃদয় পুরাণো।
এ আঁধার আবিলতা মাঝে
একটি উজ্জ্বল দীপ সম,
জ্যোতির্ম্ময় মূরতি তোমার
উজলিবে হীন কক্ষ মম !

সঙ্কল্প।

(১)

মানব দুয়ারে, ভুলেও কখনো,
যাবনা, যাবনা, যাবনা আর,
মানবের ঠাঁই, লভেছি কেবল
বেদনা বেদনা বেদনা সার।

(২)

"মানব" "মানব," কে বলে "মানব,"
"মানব" দানব দানব হয়,
মানবের প্রাণে, এত কঠোরতা,
কভু যে সম্ভব—সম্ভব নয়।

(৩)

"সংসার" "সংসার," কিসের "সংসার,"
"সংসার" অসার অসার হয়,
মোহ-আবরণে, মহা হিংসা দ্বেষে,
কেবলি জড়িত, জড়িত রয়।

(৪)

কেঁদে জনমিনু, সারাটী জীবন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যায়,
আঁখি-পারাবার গিয়েছে শুকায়ে,
হৃদয় মরুভূ, মরুভূ হায় !

(৫)

কে ডাকে আমারে, পিছু হতে ওই,
ডেকোনা ডেকোনা ডেকোনা ভাই,
ভেবেছি এবার, লুকাব বিজনে,
চলেছি ছুটিয়া ছুটিয়া তাই।

(৬)

না না ভাই! জেনো, এ নগণ্য হতে
না হবে জগতে কোনও কাজ,
সুখ, সাধ, আশা, দিয়ে বিসর্জ্জন,
তাই ত যেতেছি নিভৃতে আজ।

(৭)

তাতো ভাই! ঠিক, ক্ষুদ্র তৃণ হতে (ও)
জগৎ অনেক ভরসা করে,
আমি ত মানব, কেন তবে বৃথা,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইব মরে?

(৮)

তাই হোক্ তবে, হিমাদ্রি মতন
দাঁড়াব এবার পাতিয়া বুক,
ভীষণ অশনি- আঘাতেও আর,
হব' না আকুল, পাব না দুখ।

(৯)

যারা মোরে ভালবাসে, তোষে নিতি যত্নে ভাষে,
তাদের সঁপিব আমি
স্নেহ প্রতিদান,
যারা মোরে ঘৃণা করে, পায়ে ঠেলে অনাদরে,
তাদেরো সেবায় আমি
নিয়োজিব প্রাণ।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

শান্তি।

বিশাল জগতে শান্তি শান্তি করি,
আকুল পিয়াসে কেন কেঁদে মরি,
শান্তি যে বিরাজে হৃদয়ের মাঝে।
নিজের হেলায়, শান্তি নাহি পাই,
হাহাকার করি কাঁদিয়া বেড়াই,
মিছা মিছি দুষি গো হৃদয়রাজে।
শান্তি নাহি পাই নিজ ব্যবহারে,
করি করাঘাত আপনার শিরে,
দুষিগো সদাই অপর জনে।
কেহ কি কাহারে, শান্তি দিতে পারে,
শান্তি যে বিহার নিজ ব্যবহারে,
শান্তির সম্বন্ধ শুধু মনের সনে।

আপন হৃদয় নির্ম্মল রাখিলে
ভাসিব আপনি শান্তির সলিলে
শান্তি অন্বেষিতে হবে নাক আর।—
পাইলে একটু শান্তির সন্ধান
মুছিবে নয়ন, স্নিগ্ধ হবে প্রাণ,
আপনা হইতে কমিবে যে ভার।
সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, ঈশচিন্তা আর,
উপাসনা ভক্তি শান্তির আধার,
পরম সন্তোষ মিলে সব কাজে।
এই উপদেশ করিলে পালন,
সকল অশান্তি করে পলায়ন
বিরাজে পরম শান্তি হৃদয়মাঝে।

তবে কেন হায় শান্তি শান্তি করি,
হৃদয় আবেগে মিছে কেঁদে মরি,
শান্তি কভু নাহি পাই কোন কাজে।
শান্তি যে হৃদয়ে, বাহিরে ত নয়,
হৃদয়কুটীর শান্তির আলয়,
শান্তি যে সতত সেথায় বিরাজে।

শান্তি শান্তি করি কাঁদিব না আর,
অন্বেষিব শান্তি হৃদয়ে আমার,
নীরবে সাধিব জীবনের ব্রত।
ওহে দয়াময়, দাও মনে বল,
তোমারে স্মরিয়া মুছি আঁখিজল,
হ'ক মোর প্রাণ তব কাজে রত।

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা পাল, চট্টগ্রাম।

১৩১৭ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।